নবনবীন

মিষ্টি-মধুর নতুনত্বের আনন্দের মজা চাখুন!

দারুণ ভাল নতুন বন্ বন্
এনেছে নিউট্রিন,
নি:সন্দেহে!

মিল্ক ক্রিম • চকোমিন্ট
লিমন কোকোনাট • ফ্রুটি

নিউট্রিন
বন্ বন্

nutrine নিউট্রিন ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর স্যুইট
নিউট্রিন কন্‌ফেকশনারী কোং প্রা: লি:, চিত্তুর (অ: প্র)

আনন্দমেলা

২ আশ্বিন ১৩৯২ □ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ □ ১১ বর্ষ ১২ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

হরে-রাম। তারাপদ রায় ৩৫

গল্প

চোর। মঞ্জিল সেন ১১

ভূতের মতোই। হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭

তিন কাণ্ড। কল্যাণ চক্রবর্তী ২৫

ক্যামেরা। জীবন ভৌমিক ৩২

বিশেষ রচনা

হিমালয়ের পাঠশালায়। নবনীতা বসু ৫

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৯

শয়তানের চোখ। সমরেশ মজুমদার ৫১

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭

কবিতা ও ছড়া

আমি যাই মুরছো। সুদেষ্ণা সরকার ২৭

এই সেদিনও। কার্তিক ঘোষ ৩৩

ডাক্তারবাবু বলছেন

শরৎকালে কী করবে। (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৪৫

শার্লক হোমসের গল্প

মণিমুকুট। সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫

লেখাপড়া

চোগা,চাপকান (অর্থ জানো)। দেব-সেনাপতি ১০

সিনেমা থেকে ফিরে (সহজে ইংরেজি)। প্রসাদ ১০

খেলাধুলো

শাবাশ ইস্টবেঙ্গল। অশোক রায় ৫৮

ক্রিকেট ছাড়লেন বেঙ্কটরাঘবন। নৃপতি চৌধুরী ৬২

ইংল্যাণ্ডের ইনিংসে জয়। সম্রাট রায় ৬৩

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১

সদাশিব ৪৯, গাবলু ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা ৪৬, শব্দসন্ধান ৪৬, মজার খেলা ৪৭

হাসিখুশি ৪৭, তোমাদের পাতা ৬৫

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দ পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬'ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ৫০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১

ফোন নং—৪১-০০৬৯

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন

একটি কোমল, গোলাপী লোশন...
ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর
মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা
বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই
কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রঙরূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।

OBM/4151 BEN

হিমালয়ের পাঠশালায়

নবনীতা বসু

কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের ভরুকা মাউন্টেনিয়ারিং ট্রাস্ট প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন স্কুলের কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে পুরুলিয়ার অযোধ্যা বা মাঠা পাহাড়ে, বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় এবং বিহারের সিংভূমের রোয়াম জঙ্গলে প্রকৃতি-পাঠের আসর বসায়। সেখানে ছোট-ছোট শহুরে ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি এবং পর্বতারোহণ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষাক্রমগুলোর প্রাথমিক পর্বে যারা কৃতিত্ব দেখায় এবং যারা নির্দিষ্ট বয়স অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে পড়ে তাদের নিয়ে এই ক্লাবটি প্রায়ই পর্বতারোহণের জন্য হিমালয়ে যায়।

সম্প্রতি বি· এম· টি· কলকাতার কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য-অঞ্চলে পর্বতচারণ শিক্ষার সাতদিনের একটি পাঠক্রম শেষ করে এল। এই শিক্ষাক্রমে শিয়ালদার লরেটো, সাউথ পয়েন্ট এবং সাউথ সুবার্বন স্কুলের মোট আটজন ছেলেমেয়ে অংশ নিয়েছিল। শিক্ষক হিসেবে গিয়েছিলেন মোট তিনজন।

লরেটোর চারজন মেয়ের একজন হওয়ার দুর্লভ সুযোগ আমি কী ভাবে পেয়ে গেলাম, জানি না। অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানা, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার কোনও প্রয়াসকে আমার অভিভাবকরা কখনও খারাপ চোখে দেখেন না, তাই অনুমতি পেতে দেরি হল না। এই ব্যাপারে আমাদের স্কুলের কাছ থেকেও সবরকম সহায়তা ও উৎসাহ পেলাম।

কালিম্পঙে আমরা সবাই…

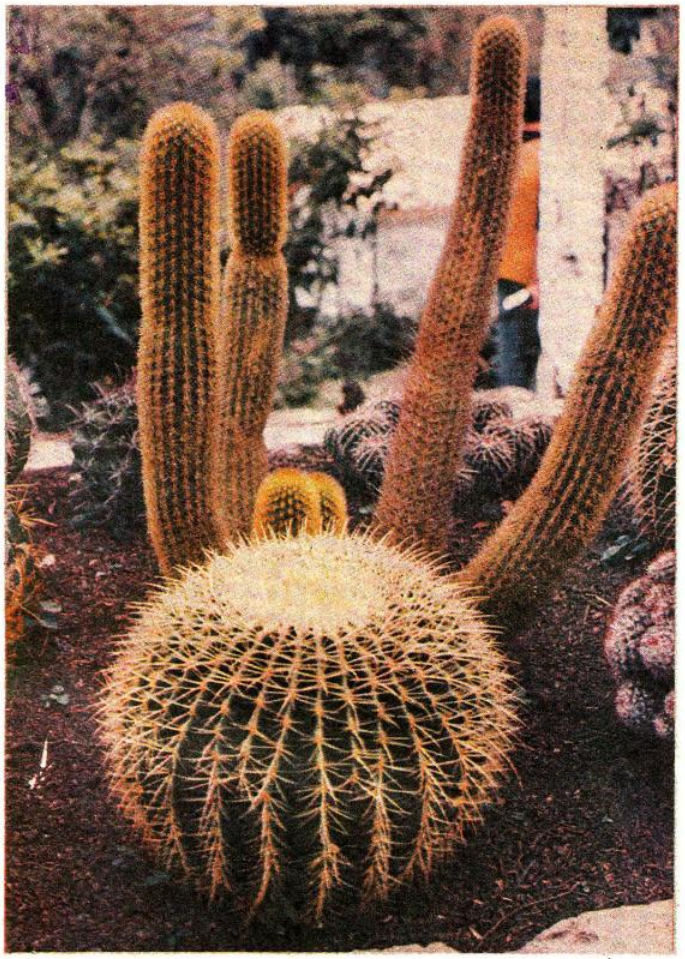

আশ্চর্য সুন্দর ক্যাকটাসের কয়েকটি নমুনা

যথাসময়ে হাওড়া থেকে নিউ বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। পরের দিন পৌঁছলাম নিউ জলপাইগুড়িতে। কালিম্পং যাওয়ার পথে বাসে ডানদিকের সিটগুলো দখল করলাম, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য খুব কাছ থেকে দেখব বলে। বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে ছবির মতো সব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। দেখলাম, অপূর্ব সুন্দর হিরের নেকলেসের মতো তিস্তা নদী। পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট লোকালয়, অরণ্যের বিচিত্র বর্ণসম্ভার, আর সবচেয়ে সুন্দর তিস্তার উপর সেবক সেতুটি।

একই তিস্তার নানান রূপ দেখতে দেখতে অবশেষে কালিম্পং পৌঁছলাম। কালিম্পংয়ে আমাদের সাময়িক শিবির বা বেস ক্যাম্প হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের অতিথিশালায়।

বিকেলে গেলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত গৌরীপুর হাউস-এ। এই বাড়ি থেকেই ১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখ আকাশবাণীর সহায়তায় 'জন্মদিন' কবিতাটি বিশ্ববাসীর উদ্দেশে তিনি প্রচার করেছিলেন। এখন এখানে স্থানীয় মেয়েরা নানা ধরনের হাতের কাজ শেখে।

৩০ এপ্রিল, ১৯৮৫

আজ ভোরে উঠে গেলাম কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতালের কাছে ভিউ পয়েন্টে। দূরবিনের দৌলতে গোটা কালিম্পং শহরটা ছবির মতন ভেসে উঠল আমাদের চোখের সামনে।

মনে হতে লাগল, কালিম্পংয়ের জল সরবরাহকারী দেলো ট্যাঙ্ক, সিংগালিলা পর্বতমালা, সিকিমে যাওয়ার রাস্তা, রঞ্জিত আর তিস্তা নদীর সঙ্গমস্থল, কালিম্পংয়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গা দূরবিন ডাণ্ডা—সব যেন আমাদের দু' হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে।

কালিম্পংয়ে আমাদের পাশের ঘরেই পেয়ে গিয়েছিলাম আমাদের এক কাকিমাকে। তিনি অনেক তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কালিম্পংয়ে রাস্তার নাম বিশেষ একটা নেই। এখানে নাকি মাইল দিয়েই বেশির ভাগ রাস্তা চিহ্নিত করা হয়। যেমন, ৯$^{৩}/_{৪}$ মাইল কালিম্পং রোড ইত্যাদি। যদিও কালিম্পংয়ের কমলালেবু বেশ বিখ্যাত, কিন্তু 'স্কোয়াশ' ফলটাই বেশি প্রচলিত।

দুপুরবেলা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দূরবিন ডাণ্ডায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় শেষপর্যন্ত কালীবাড়ি অবধি গিয়ে ফিরে আসতে হল। কালীবাড়ির পাথরের কালীমূর্তিটি বহুদিন আমার মনে থাকবে।

১ মে, ১৯৮৫

আজ সাতসকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার সুবিধের জন্যে জিপে করে রওনা দিলাম লাভার উদ্দেশে। কালিম্পং থেকে লাভার দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার, সেখানে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল দেড় ঘণ্টার মতন। মাঝে আমরা লাভার থেকে ১৬ বা ১৭ কি মি আগে আলগড়া বাজারে চা খাওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ থেমেছিলাম। পথে পিণ্টলে ঝোরা, সুকরাবারি ঝোরা ইত্যাদি অনেক শুকনো ঝোরা দেখলাম।

আলগড়া পেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল পথের দু' ধারে ঘনসবুজ পাইনের বন। আগে যখন কালিম্পং থেকে এই দিকের নরম ছাইরঙা মেঘে ঢাকা পাহাড়গুলো দেখতাম তখন আনন্দে, উল্লাসে ফেটে পড়তাম। আর আজ সেই মেঘগুলোর মধ্যে দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি লাভার দিকে।

অবশেষে একটা সুন্দর কাঠের ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছলাম। ভারী সুন্দর জায়গায় বাংলোটা তৈরি করা হয়েছে। চারদিকে শুধু পাহাড় আর ঘন সবুজের মেলা। বাংলোর লনে আছে নরম সবুজ কার্পেট আর তাতে বোনা অজস্র লাল, নীল, হলদে ফুল।

ভেবেছিলাম, চুমংগ্রামে যাব, কিন্তু বাংলোর কর্মচারীদের এবং চেকপোস্টের পুলিশদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, চুমং ১৬/১৭ কি মি দূরে। বেলা অনেক হয়ে যাবে বলে সেদিন মোট ৫ কিলোমিটার হেঁটে আমরা গেলাম কলবুং গ্রামে। সামাবিয়াং টি-এস্টেট থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই ছোট্ট কলবুং গ্রামটা চোখে পড়ে।

পাকা রাস্তা আর পাকদণ্ডী বেয়ে যতখানি নীচে নেমে এসেছিলাম, ঠিক ততখানি পথই কসরত করতে-করতে আবার উপরে লাভা বাংলোয় গিয়ে পৌঁছলাম। পাকদণ্ডীর পথটা মানুষের তৈরি হলে কী হবে, এখন এই পথে শুধু গোরু, মোষ আর ছাগলের আনাগোনা। এই পথেই দেখলাম এক রকমের পাতা, যার নাম 'কোবরা-লিফ'। নামের সঙ্গে চেহারায় অনেক মিল আছে পাতাটার। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি কোনও বিষধর সাপ ভয়ঙ্কর ভাবে ফণা তুলে ছোবল মারতে আসছে।

২ মে, ১৯৮৫

আজ ঘুম ভাঙল পাহাড়ি বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে। এই বর্ষা ভারী মজার। বৃষ্টির মধ্যে সোনালি মেঘের আবির্ভাব দিনটিকে বড় আনন্দময় করে তুলেছিল। বাংলোঘরে বসে কাঁচের জানলায় যখন দূরের সিকিম-ভুটানের তুষারে মোড়া হিমালয়ের মেঘের আনাগোনা দেখছিলাম, তখন মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল।

মেঘের অঝোর কান্না দেখে ভেবেছিলাম, আজ আর পাহাড়ে ওঠা হবে না। কিন্তু হঠাৎ আকাশ হেসে উঠল। লাভাবাজার আর লগ-কেবিনে পৌঁছে আমরা চড়লাম ২৩৬৫ মিটারের একটি পাহাড়ে। শিখরে উঠে বিশ্রাম নিলাম আমরা। লিচুর মতো ছোট ছোট ফলে মাটি ছেয়ে রয়েছে। খেতেও সুস্বাদু। নাম 'অলখ-আ'।

ঠিক ছিল আমরা ২৬০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত পাংখাসারি বাংলোতে যাব, কিন্তু বদলে গেলাম ২০০০ মিটার উঁচু ইংরেজ আমলের আর একটা পাংখাসারি বাংলোয়। বাংলোটি আর ইঁট কাঠ পাথরের বাংলো নেই। সেখানে পড়ে রয়েছে বাংলোর ভগ্নস্তূপ। পাশেই বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ি ঝরনা।

এরপর টেরাস প্লানটেশান দিয়ে আমরা নীচে নেমে যেতে লাগলাম। কিন্তু হায়! কোনও গ্রামেরই দেখা মিলল না। অগত্যা আমাদের উপরে উঠে আসতে হল। পাংখাসারি বাংলোরই কাছে আর একটা রাস্তা ধরে আমরা নীচে এলাম একটা পাকা রাস্তায়। এতক্ষণে কুয়াশায় জোঁক (স্থানীয় ভাষায় জুঁকা) আর আগাছায় ভরা, পিছল পাথুরে পথ দিয়ে নামছিলাম অনিশ্চিতভাবে। হঠাৎ পথের এবং বসতির দেখা মিলতে আমাদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, গ্রামটার নাম 'কুয়াপানি'। কুয়াপানিতে স্থানীয় মেয়েদের ছোট একটা চায়ের দোকানে কোনও রকমে সেদিনের দুপুরের খাওয়া সেরে ফের হাঁটা শুরু করলাম। এবার গন্তব্যস্থল লাভা বাংলো। কখনও পাকা রাস্তা, কখনও বা পাকদণ্ডী বেয়ে পৌঁছলাম বাংলোয়। আজ মোট ২৫ কিলোমিটার হেঁটেছি।

৩ মে, ১৯৮৫

আজ আমাদের কালিম্পংয়ে ফেরার দিন। আজ থেকেই শুরু হল ফেরার পালা। সকালে বাসে করে কালিম্পং ফেরার সময় খুব খারাপ লাগছিল। বড্ড কষ্ট হচ্ছে এই পাঁচদিনের পর্বতচারণ আর প্রকৃতিপাঠের আসর শেষ করে ফিরে যেতে।

আজ কালিম্পংয়ে গিয়েছিলাম ক্যাকটাস-অর্কিড দেখতে। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ রকমের ক্যাকটাস আর অর্কিড আছে এখানে। অর্কিড আর ক্যাকটাস দেখার আনন্দ ভাষায় বোঝানো যায় না। কত রকমের যে অর্কিড আর ক্যাকটাস আছে এখানে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

৪ মে, ১৯৮৫

আজ আমরা বাসে করে প্রথমে গেলাম শিলিগুড়ি। সেখান থেকেই রকেট বাস ধরলাম কলকাতায় ফেরার জন্যে।

নগাধিরাজ হিমালয় যেন মৌন ঋষির মতন ধ্যানে মগ্ন। তবুও যেন মনে হল এই স্বল্প সময়ের ভ্রমণ করতে এসে আমরা হিমালয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছি। সেও আমাদের দু'হাত ভরে আনন্দ দিয়েছে। হিমালয়ের মতন সুন্দর, পবিত্র সঙ্গ বুঝি আর কোনও দিনই আমরা পাব না।

ফসিলের খোঁজে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যেখানে এবার অলিম্পিকের আসর বসেছিল, সেই লস্ এঞ্জেলিস শহরের ধারেকাছে কোথাও—মনে করো, তুমি গিয়ে পড়েছ দশ লক্ষ বছর আগে। কোথাও মানুষজনের চিহ্ন নেই। শুধু ধুধু করছে ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর আর তারই একধারে টইটম্বুর ডোবা। চিকচিক করছে জল। সেখানে জল খেতে আসছে তৃণভোজী প্রাণীর দল—তৃষ্ণার্ত যত হাতি ঘোড়া উট। হন্তদন্ত হয়ে ডোবার মাঝ-বরাবর তারা এগিয়ে যায়। সেখানে হঠাৎ এক আঠালো কাদায় তাদের ঠ্যাংগুলো আট্‌কে গেল। যেন কোনও পাতা ফাঁদে তারা পা দিয়েছে। আর তাদের উদ্ধার নেই।

ছাড়া পাবার জন্যে তারা আছাড়ি-পিছাড়ি করে। আর তাদের ত্রাহি-ত্রাহি ডাক শুনে শিকারের লোভে মহানন্দে ছুটে আসে ক্ষুধার্ত যত মাংসাশী প্রাণী—নেকড়ে বাঘ, রাক্ষুসে শকুন আর খড়্গদন্তী বাঘ। তাদেরও হয় লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুর দশা।

আসলে জলের ডোবাটা ছিল আলকাতরার একটা প্রকাণ্ড খাদের মাঝখানে। হাজার-হাজার প্রাণী ধরা পড়ে এই মৃত্যুর ফাঁদে। তারপর কালক্রমে সেই আলকাতরা জমতে-জমতে নিরেট পাথর হয়ে গেছে।

লক্ষ-লক্ষ বছর পরে বৈজ্ঞানিকেরা এইসব পাথরের বুক চিরে আদিম পৃথিবীর সেই বিস্মৃত অতীতকে বার করছেন। এই রকমের মাত্র একটি খাদ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে খড়্গের মতো দাঁতালো বাঘের সাতশোর বেশি কঙ্কাল।

আলকাতরা জমে-জমে যতই শক্ত হয়েছে, ততই কঙ্কালের গা থেকে হাড়গোড়গুলো আলগা হয়ে খসে-খসে পড়েছে। তা বলে একটা হাড়ও নষ্ট হয়নি কিংবা খোয়া যায়নি। ফলে আলাদা-আলাদা সেইসব হাড় নতুন করে জোড়া লাগিয়ে পুরো কঙ্কাল খাড়া করে তুলতে বৈজ্ঞানিকদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।

এমন মূল্যবান খাদ বড় একটা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া মৃত্যুর পর প্রাণিদেহ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। এমন কী, হাড়গুলো পর্যন্ত গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে যায়। নইলে এদের হাড়মাস অন্য জন্তুদের পেটে যায়।

এ সত্ত্বেও এখনও খুঁজলে আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে পারে। তা দিয়ে অতীতের অনেক ফাঁক ভরা যায়। আজও তাই হন্যে হয়ে বৈজ্ঞানিকেরা ফসিলের খোঁজে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছেন।

(উপরে) গাছের গুঁড়ির ফসিল. (ডাইনে) কনেটিকাট উপত্যকায় ডাইনোসরের শিলীভূত পদচিহ্ন

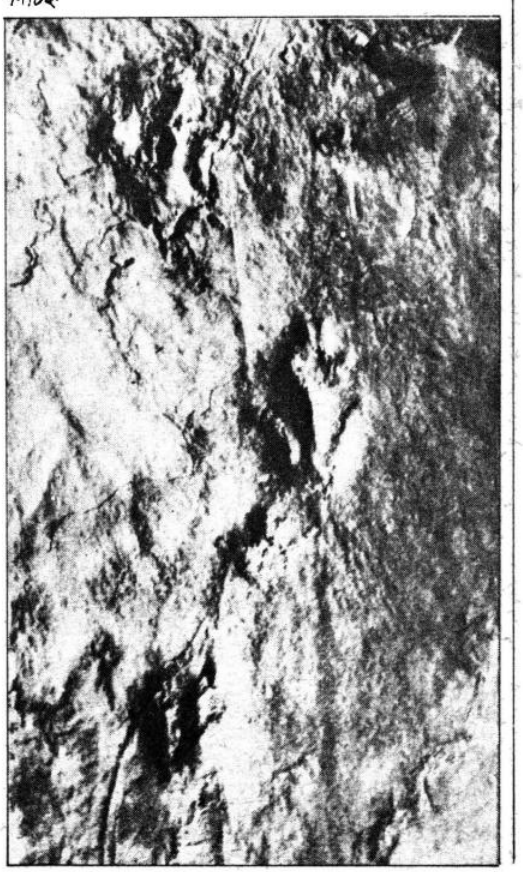

LINTAS.LR 42-2739 BG

নতুন লিরিল
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!

লিরিল অনন্য নতুন রূপে !
মন কেড়ে নেওয়া
এক অপরূপ নতুন সুরভিতে...
আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে।

নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

আপনাকে পরিণত করে লাবণ্যে ঢলঢল নারীতে!

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

অর্থ জানো

চোগা-চাপকান...

পোশাকের রীতি কালক্রমে বদলে যায়। একশো বছর আগে বাঙালির যে পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল তা আর নেই বললেই চলে। নীচের শব্দগুলি সবই পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে। শব্দগুলির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

(১) **চোগা**— (ক) ঢিলা পাঞ্জাবি। (খ) বুক-কাটা ঢিলা লম্বা জামা। (গ) আঁটসাট পায়জামা। (ঘ) মাথার বিশেষ ধরনের পাগড়ি।

(২) **জামিয়ার**— (ক) দামি আলোয়ান। (খ) জরির কাজ করা পশমের জামা। (গ) ফুলতোলা মূল্যবান কাশ্মিরি শাল। (ঘ) নকশাযুক্ত রেশমের জামা।

(৩) **বালাপোশ**— (ক) মূল্যবান গরম চাদর। (খ) বাল্যকালে পরিধানের গরম চাদর। (গ) তুলো-ভরা গায়ের কাপড়। (ঘ) তুলো-ভরা কাপড়ের গরম জামা।

(৪) **চাপকান**— (ক) হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি। (খ) হাঁটু পর্যন্ত ঢিলা লম্বা জামা। (গ) লম্বা আলখাল্লা। (ঘ) ঢিলা পায়জামা।

(৫) **দোলাই**— (ক) বালক-বালিকাদের গায়ে দেবার শাল। (খ) গায়ের গরম চাদর। (গ) ছোটদের ঢোলা গরম জামা। (ঘ) দুই স্তর কাপড়ের তৈরি শীতবস্ত্র।

উত্তর : ১। চোগা— (খ) বুক-কাটা ঢিলা লম্বা জামা। জানু পর্যন্ত লম্বা। এতে বোতাম লাগানো হয় না। চাপকানের উপরে চোগা পরা হত। যেমন, 'রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম' (রবীন্দ্রনাথ)।

২। জামিয়ার— (গ) ফুলতোলা মূল্যবান কাশ্মিরি শাল। এখনও অনেকে পরে থাকেন। যেমন, 'গায়ে পাঞ্জাবি আর ধুতির উপর কাশ্মিরি জামিয়ার' (সত্যজিৎ রায়)।

৩। বালাপোশ— (গ) তুলো-ভরা গায়ের কাপড়। শীতে খুব আরামদায়ক।

৪। চাপকান— (খ) হাঁটু পর্যন্ত ঢিলা লম্বা জামা। অনেকটা শেরওয়ানির মতো দেখতে, কিন্তু অত আঁটসাট নয়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের মহেন্দ্র চাপকান পরে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত। চোগা, চাপকান ফারসি শব্দ।

৫। দোলাই— (ঘ) দুই স্তর কাপড়ের তৈরি শীতবস্ত্র। ছোটদের গলায় জড়িয়ে পরাতে হয়। শব্দটি হিন্দি থেকে এসেছে।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

সিনেমা থেকে ফিরে

বাবা হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছেন, ভাল আছেন, যদিও এখনও কিছুদিন সাবধানে থাকতে হবে। বাড়িতে সবাই খুশি। চম্বল বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল। রাতে খাবার টেবিলে সেই কথাই হচ্ছিল।

Mr Roy asked, "Did you like the film? What was it about!"

"It was science fiction," Chambal replied." Not uninteresting. In places it came too close to the absurd, through."

Mr Roy said, "Science-fiction often does that. I've noticed. But then, you know, now-a-days it's hard to tell where the science ends and the fantasy begins."

"But, Daddy," Chambal protested, "there is a limit to what one can be asked to believe. Many of the things that happened in the film today appeared to be impossible."

"The impossible of today may be the commonplan of tomorrow. Look at the aeroplane. There was a time when Scientists thought nothing heavier than air would ever fly. But it's also true that in science-fiction they often put across things that belong to the world of fantasy. Now-a-days almost anything goes in the name of science. You must learn to distinguish the true from the false."

Chambal said, "But it was good to watch it all happening, all the same."

Mr Roy said, "Well, the fantastic has its appeal, I know.

এবারেও কতকগুলো বিশেষণের বিশেষ্য-পদের মতো ব্যবহার লক্ষ করো :

Absurd, impossible, commonplace, true, false, fantastic.

It came too close to the absurd.

The impossible of today is the commonplace of tomorrow.

You must learn to distinguish the true from the false.

The fantastic has its appeal.

প্রসাদ

তবে কি নতুন ঘড়ির
লোভ সামলাতে
পারেনি রাধু

চোর

মঞ্জিল সেন

বাসটা শরৎ বসু রোড আর সাদার্ন এভিনিউয়ের মোড়ে থামল। এর পরের স্টপেই নামতে হবে পাপুকে। বাসটা ছাড়তেই ও উঠে পড়ল, এগিয়ে চলল গেটের দিকে। ঠিক তখনই ঘটল একটা ঘটনা।

দুপুর বেলা, বাসে যাত্রী কম, তবু গেটের মুখে কয়েকটা ছোকরা ঝুলছিল, বরং বলা চলে যাত্রীদের ওঠা-নামার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। হঠাৎ এক জোয়ানমতো ভদ্রলোক একটা ছেলের জামার কলার চেপে ধরে তাকে এক টানে ভেতরে তুলে বললেন, "আমার পকেট মারবার চেষ্টা করছিল, হাতেনাতে ধরে ফেলেছি।" বলেই এক রদ্দা কষালেন ঘাড়ে। ভদ্রলোকের বেশ দশাসই চেহারা, আর ছেলেটার বয়স কত আর হবে, চোদ্দ কি পনেরো। ওই এক রদ্দায় ওর মুখ দিয়ে কোঁক করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে বাসের যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। যে পারছে, হাতের সুখ মিটিয়ে নিচ্ছে। ছেলেটার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, কিন্তু আর কোনও শব্দ করল না, মুখ বুজে মার খেল।

"ওগুলোকেও ধরুন," দরজার কাছে ঝুলছিল বাকি যে ছোকরার দল, তাদের দিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রলোক বললেন, "ওরা একটা গ্যাং। দেখছেন না গেটের মুখে কেমন ব্যূহ রচনা করে আছে, অসাবধানী যাত্রী নামবার বা ওঠবার মুখে পকেট সাফ করে দেবে। দুধে শয়তান সব, এই বাচ্চা বয়স থেকেই এ লাইনে হাতেখড়ি—"

তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই ছোকরার দল টুপ-টুপ করে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ল, পরের স্টপ এসে যাওয়ায় বাসের গতিও কমে এসেছিল।

সেই ছেলেটির অবস্থা শোচনীয়, বারোয়ারি মারের চোটে মুখ ফুলে উঠেছে, ক্ষত-বিক্ষত চেহারা। বাসটা থামতেই সেই ভদ্রলোক ওকে এক ধাক্কায় গেট দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, "যা, তোর বরাত ভাল, ছেড়ে দিলাম, পুলিশে দিলাম না।"

ছেলেটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছিল, হাত-পা ছড়ে গেল। সেই অবস্থায় উঠে হাত-পা একটু ঝেড়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটা দিল গোল পার্কের দিকে। পাপুও নেমে পড়েছিল। ঠিক ছেলেটার পেছন পেছন ও হাঁটছিল। ছেলেটার জন্য ওর কেমন মায়া হচ্ছিল। কী চোরের মারটাই না খেল! এই বয়সেই পকেটমারের দলে ঢুকেছে! কতই বা বয়স, ওর চাইতেও ছোট।

পাপু হঠাৎ ওকে ডাকল, "এই ছেলেটা।"

ছেলেটা পেছন ফিরে তাকাল, দু'চোখে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি। ভাবছে বোধহয় পাপুও মারবার জন্য আসছে।

পাপু বড়-বড় পা ফেলে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, "এসব কাজ কেন করিস? লোকের কাছে মার খেতে হয়।"

"তা কী করব? খেতে দেবে তুমি?" ছেলেটা যেন ভেংচে উঠল।

পাপু এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, "খেতে দিলে এ কাজ তুই ছেড়ে দিবি?"

"শখ করে কেউ এ কাজ করে নাকি," ছেলেটি জবাব দিল, "পেটের জন্যেই তো করা।"

"কে আছে তোর?" পাপু জিজ্ঞেস করল।

"কেউ নেই," ছেলেটি অম্লান বদনে বলল, "আমরা তো রিফুজি, মা-বাবা সব না খেতে পেয়ে মরে গেছে।"

পাপুর মন সমবেদনায় ভরে গেল, বলল, "কাজ করবি তুই?"

"দেবে তুমি কাজ?"

"চল্ আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?" ছেলেটি এবার সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল।

"আমাদের বাড়ি," পাপু বলল, "আমার ফাই-ফরমাস খাটবি, কাজকর্ম করবি, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবি, মাইনেও পাবি।"

"সত্যি বলছ?" ছেলেটির যেন ওর কথা বিশ্বাস হয় না।

"সত্যি বলছি," পাপু বলল, "তবে কোনওদিন চুরি করবি না কথা দিতে হবে।"

"খেতে পেলে আবার চুরি করব কেন," ছেলেটি সাফ জবাব দিল, "পেটের জন্যেই তো চুরি করা।"

"ঠিক বলছিস তো?" পাপু বলল।

"ঠিক নয় তো কি মিছে কথা বলছি।"

"তবে চল্ আমার সঙ্গে," পাপু বলল, "দেখিস পরে যেন তোর জন্য আমাকে আবার ঝামেলায় না পড়তে হয়।"

"না বাবু, ও চিন্তা তুমি কোরো না।"

"তার আগে এক কাজ কর," পাপু বলল, "ওই কলের জলে মুখ ভাল করে ধুয়ে নে, মার খেয়ে মুখের যা চেহারা হয়েছে, তোকে বাড়ি নিয়ে গেলেই আমাকে হাজার গণ্ডা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।"

যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করে ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল পাপু।

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ঠিক ওপরে নয়, একটু ভেতরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে মস্ত বাড়ি পাপুদের, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাপুর বাবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, নিজের ফার্ম আছে, খুব নামডাক। পাপুর দাদুও বেঙ্গল গভর্নমেন্টের বড় অ্যাকাউন্টস অফিসার ছিলেন। পাপু মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ও এবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি· কম. পরীক্ষা দেবে, অ্যাড্‌ভান্স অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে অনার্স আছে, লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল। বি· কম· পাশ করেই ও সি· এ· পড়বে, ইতিমধ্যে এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা দিয়ে রেখেছে। বাবার ফার্মেই ওকে একদিন বসতে হবে তো।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, "এ আবার কাকে নিয়ে এলি রে পাপু? মুখে অত কাটা-ছেঁড়া কেন! আহা এই কচি ছেলেটাকে কে মারল এত?"

পাপু মাকে জানে, দয়ার শরীর, কারও কষ্ট দেখলে মন কেঁদে ওঠে। ও বলল, "ছেলেটার মা-বাবা কেউ নেই। এখানে-ওখানে থাকে, কী তক্কাতক্কি হয়েছিল রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে, দিয়েছে পিটিয়ে।"

"তা ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলি না কেন? ওষুধ লাগিয়ে দিত।"

"আমি সে ব্যবস্থা করছি, কিন্তু মা," পাপু একটু আবদারের গলায় বলল, "তুমি আমাকে একবার বলেছিলে, আমার সব কাজের জন্য বাচ্চা একটা ছেলেকে রেখে দেবে, আমিই তখন মানা করেছিলাম। কিন্তু এ-ছেলেটা বড় গরিব, খেতে পায় না, থাকবারও জায়গা নেই। ও আমাদের বাড়ি থাকুক, ও হবে," একটু হেসে পাপু বলল, "আমার ভ্যালেট।"

মা বললেন, "সে কথা তো আমি অনেকবারই বলেছি। তোর জামাকাপড়, বইপত্তর গুছিয়ে রাখবে, ফাই-ফরমাস খাটবে, তা তুই তখন ঠাট্টা করে বলেছিলি রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছি, এবার আমাকে একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।" মা একটু হাসলেন।

পাপু মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "তবে সেই কথাই রইল। ও আমার কাছেই থাকবে, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে আর মাসে মাসে ..." তারপরই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, কত টাকা হলে তোর চলবে?"

ছেলেটা মাথা চুলকোল, তারপর ফিক্ করে হেসে বলল, "তা দিও তোমাদের যা খুশি, আমার দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেলেই হল। তবে একটা বিছানা দিতে হবে, অনেকদিন বিছানায় শুইনি।"

"ঠিক আছে," পাপু হাসল, "তোশক, বালিশ সব পাবি।"

"তা তো হল," মা বললেন, "কিন্তু ছেলেটাকে চিনিস না, জানিস না, রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এলি, যদি চুরিটুরি করে পালায়?"

পাপু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, শুনছিস মা'র কথা, তোকে বিশ্বাস করে ঘরে এনে ঠাঁই দিলাম, চুরিটুরি করে ভেগে পড়বি না তো?"

চুব্বির কথায় ছেলেটার মুখে একটা ছায়া নেমেছিল, পাপুর হাল্‌কা ধরনের কথায় সেটা মিলিয়ে গেল, বলল, "না, না, আমি আর চুরি করব না।"

মা এবার ভুরু কোঁচকালেন। পাপু বুঝল আনন্দের আতিশয্যে ছেলেটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে, "আর চুরি করব না।" ও তাড়াতাড়ি বলল, "মানে ও বলতে চায় চুরি করবে না, ওদের কথাবার্তাই অমন।"

ছেলেটার নাম রাধাকান্ত, নামের বাহার আছে। পাপু ওর নাম সংক্ষেপ করে নিয়েছে, রাধু। তবে হ্যাঁ, ছেলেটা সুশ্রী। হয়তো এক সময় রঙ ফর্সা ছিল, এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। কোঁকড়ানো চুল, আর ডাগর-ডাগর দুটো চোখ। ওই দুই চোখ দিয়ে যখন তাকিয়ে থাকে তখন মনে হয় যেন নিষ্পাপ, অবোধ বালক অথচ এই ছেলেটাই দলের সঙ্গে ট্রামে-বাসে যাত্রীদের পকেট সাফ করত। ওকে দেখে কথাটা বিশ্বাসই হতে চায় না।

রাধু কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পাপুর ডান হাত হয়ে উঠল, ওকে ছাড়া পাপুর এক দণ্ড যেন চলে না। এই জামাটা ইস্ত্রি করে নিয়ে আয়, এই বইটা অমুক ছেলেকে দিয়ে আয়, এটা কর্, ওটা কর্—রাধু হাসিমুখে সব করে, খুব চটপটে। পাপুকে এখন আর ও বাবু বলে না, বলে দাদাবাবু, পাপুই শিখিয়েছে। পাপুর বইয়ের টেবিল আগে মনে হত যেন জঞ্জালের স্তূপ, এখন আর চেনা যায় না। জিনিসপত্র ছড়ানো পাপুর বরাবরের অভ্যেস, মা'র শত বকুনিতেও শোধরায়নি। এখন কিন্তু সেটি হবার জো নেই। রাধু শুধু গুছিয়েই রাখে না, পাপু এলোমেলো করলেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে, বলে, "দাদাবাবু, আমি এত কষ্ট করে সব গুছোলাম, তুমি লণ্ডভণ্ড করে দিলে!" ছেলেটার প্রতি মমতার জন্যেই হোক কিংবা ওর বকুনির ভয়েই হোক, পাপু এখন এ-ব্যাপারে অনেক সাবধানী।

পাপু ওকে ওর পুরনো জামা-প্যান্ট একপ্রস্থ দিয়েছে, পুরনো হলেও ছেঁড়া নয়, আর দামি কাপড়ের। রাধু তো মহাখুশি। ওই পোশাকে আজকাল ওকে বেশ স্মার্ট লাগে। পাপু যখন কলেজে যাবার জন্য খেতে বসে, ও তখন পাপুর কলেজের জামা-প্যান্ট ঠিক করে, জুতো পালিশ করে রাখে, বই-খাতা-কলম সব হাতের কাছে গুছিয়ে রাখে যাতে পাপুকে খুঁজতে না হয়।

পাপু একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁ রে, রাধু, তুই লেখাপড়া শিখিসনি?"

"কেলাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলাম," একটু সলজ্জ হেসে জবাব দিয়েছিল রাধু, "ন'ঘরের নামতা জানি।"

রাধুর মা-বাবা নাকি দেশ ভাগ হবার পর আরও অনেকের সঙ্গে চলে এসেছিল। সেখানে তাদের নিজেদের চাষের জমি ছিল, ঘরবাড়ি ছিল। মা-বাবার মুখেই রাধু এ কথা শুনেছে।

সব ছেড়ে প্রায় একবস্ত্রে চলে আসতে হয়েছিল। সঙ্গে ছিল রাধুর এক দাদা আর দিদি। রাধুর তখনও জন্মই হয়নি। এখানে অনেক কষ্ট করে তাদের থাকতে হয়েছিল, রুজি-রোজগার তেমন ছিল না। তারপর একদিন নাকি দিদি হারিয়ে গিয়েছিল। দাদাও কোথায় যে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। রাধুর যখন বারো বছর বয়স, তখন ওর মা-বাবা দুজনেই মারা গিয়েছে। "জানো দাদাবাবু, ঠিকমতো খেতে না পেয়েই মরে গেল," রাধু ছলছল চোখে বলেছিল। তারপর থেকেই ওর ছন্নছাড়া জীবন, এখন ওর বয়স চোদ্দ। ওরই মতন অনাথ কয়েকজন ছেলের সঙ্গে ও ট্রামে-বাসে রোজগারের ধান্ধায় বেরোচ্ছিল, পাপুর আগে কেউ ওকে এমন করে কাজের কথা বলেনি।

পাপুর বড় মায়া হয় ছেলেটার উপর। সুযোগ পেলে এসব ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে, কিন্তু এদের যেন জোর করেই অপরাধের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, কারও যেন দায় নেই এদের জন্য। একটা দেশ, একটা জাতি, যদি তাদের ছেলেমেয়েদের এভাবে অবহেলা করে, তাদের জন্য সুস্থ পরিবেশ গড়ে না তোলে, তবে সেটা নিশ্চয়ই সেই দেশের এবং জাতির পক্ষে গৌরবজনক নয়, পাপু না ভেবে পারে না।

ও নিজের পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে রাধুকে নিয়ে পড়ে। ওর জন্য ও বই-খাতা কিনে এনেছে, ওকে পড়ায়। রাধুর কিন্তু মাথা বেশ সাফ, চটপট শিখে ফেলে। পাপুর খুব আনন্দ হয়, যে ছেলেটাকে ও রাস্তা থেকে তুলে এনেছে, সে ওকে নিরাশ করেনি। ও যখন বাবার ফার্মে ঢুকবে, রাধুকেও সেখানে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে। তার আগে ওকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। মা'র সঙ্গে এ নিয়ে ও কথা বলবে।

কলেজে সেদিন একটা পরীক্ষা ছিল। মিশনারি কলেজে এই এক ঝামেলা, পরীক্ষা লেগেই আছে। খেয়েদেয়ে জামাকাপড় পরে হাতঘড়িটা পাপু আর খুঁজে পায় না। এদিকে সময়ও হাতে বেশি নেই। রাধুকে ডেকে ও জিজ্ঞেস করল, রাধু বলল সকাল থেকে ঘড়িটা ও দেখেনি। পাপু রেগে গেল, বলল, "আলবত সকালে এটা টেবিলের ওপর ছিল। আমি ওটায় সময় দেখে নাইতে গেলাম, এই তো একটু আগেই।"

ওর চেঁচামেচিতে মা ছুটে এলেন, ঘড়ি পাওয়া যাচ্ছে না শুনে রাগ করলেন। দামি নতুন ঘড়ি, এবারই ওর জন্মদিনে বাবা কিনে দিয়েছেন। মা বললেন, "তোমার এই ঘরে আর কেউ তো আসে না, যে একখানা সেন্ট্রি খাড়া করে রেখেছ কাউকে ঢুকতেই দেয় না। তা ছাড়া বাড়ির কাজের লোকরা সবাই পুরনো, কোনওদিন কিছু হারায়নি।"

পাপুর মনে হল মা তো ঠিক কথাই বলছেন, সত্যিই তো ওর ঘরে রাধু ছাড়া আর কোনও কাজের লোক আজকাল ঢোকেই না। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারতে শুরু করল। তবে কি নতুন ঘড়ির লোভ সামলাতে পারেনি রাধু! ওর মনের মধ্যে চুরির ইচ্ছেটা আবার জেগে উঠেছিল! দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। রাধুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "এই, তুই নিয়েছিস ঘড়িটা?"

"না, দাদাবাবু, আমি নিইনি," রাধুর দু'চোখে কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব।

"তুই নিসনি তো কে নেবে এই ঘর থেকে," প্রায় গর্জন

করে উঠল পাপু, "ভাল চাস তো শিগ্‌গির বের করে দে।"

"সত্যি আমি নিইনি···"

"তবে রে মিথ্যুক···" প্রচণ্ড এক চড় কষাল পাপু।

"আমি নিইনি," চড় খেয়েও রাধু বলল।

এবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাপু, চড় কিল মারতে লাগল, ও যেন খেপে গেছে। মা ওকে ধরে না ফেললে ও বোধহয় বিচ্ছিরি একটা কাণ্ডই করে বসত। এত মার খেয়েও কিন্তু রাধু একটা কথাও বলল না, শুধু ড্যাবা-ড্যাবা চোখে তাকিয়ে রইল পাপুর মুখের দিকে। পাপু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "এখুনি বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। কলেজ থেকে ফিরে এসে তোকে যেন আর না দেখি। চোর কি কখনও ভাল হয়, আমারই ভুল হয়েছিল।"

ও কলেজে চলে গেল।

কলেজ থেকে ও ফিরল বিকেল চারটেয়। পরীক্ষাটা আজ তেমন ভাল হয়নি। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কি ভাল পরীক্ষা দেওয়া যায়!

নিজের ঘরে পড়ার টেবিলের কাছে চুপচাপ ও বসে ছিল। মনটা খুব খারাপ। রাধুকে অত না মারলেই হত। না-হয় একটা ঘড়ি গেছে। অমন কত ঘড়িই তো ও পাবে। কিন্তু ছেলেটার ওপর ওর খুব আশা ছিল, ভাল হবে, আর চুরি করবে না, কিন্তু মানুষের স্বভাব বোধহয় বদলায় না। যেই একটা সুযোগ পেয়েছে অমনি অপরাধ-প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বরষিত হয় আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

দিয়ে উঠেছে। ওর এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হল।

একটা কাক তখন থেকে তারস্বরে ডাকছে। ভীষণ বিরক্ত হল পাপু। কাকটার আর চেঁচাবার সময় হল না, ওর এখন মন ভাল নেই। জানলার একটু দূরেই একটা কাঠগোলাপের গাছ, সেখানে বাসা করেছে দুটো কাক, প্রতি বছর এই সময় ওরা এখানে বাসা করে। পাপুর জানলা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বাসাটা। যত রাজ্যের টুকিটাকি জিনিস জড়ো করে ওই বাসায়।

কাকটা আবার কা-কা করতেই পাপু একটা লাঠি নিয়ে জানলা দিয়ে ওটাকে তাড়াল, আর তখনই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ও। ওর ঘড়িটা! কাকের বাসায় গেল কেমন করে! তবে ও যখন সকালে নাইতে গিয়েছিল কিংবা খেতে বসেছিল তখন কাকদুটোর একটা জানলার পাশেই টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে গেছে। বাসা বানাবার সময় কাকরা নাকি চোর হয়ে ওঠে। কিন্তু রাধু···!

আর ভাবতে পারল না পাপু। একছুটে মা'র কাছে গিয়ে বলল, "মা, ঘড়িটা পেয়েছি।"

"কোথায় পেলি?" মা তো অবাক।

"ওই কাকের বাসায়, কাকটাই নিয়েছিল।"

"ও মা! মিছিমিছি তুই ছেলেটাকে চোরের মার মারলি," মা একটু অনুযোগের সুরেই বললেন।

"আমি ওকে আনতে যাচ্ছি মা," সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে নামতে বলল পাপু।

"ওকে তুই কোথায় খুঁজতে যাবি?" মা পেছন থেকে বলে উঠলেন।"

"আমি জানি ওদের ডেরা, ও আমাকে বলেছে।" পাপু আর সময় নষ্ট করল না।

গোলপার্কের কাছে, রবীন্দ্র সরোবরের উলটো ফুটপাথে একটা ঝুপড়ির সামনে বসে ছিল রাধু। দলের সবাই বেরিয়ে গেছে। ওকে ফিরে আসতে দেখে ওরা ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল, "খুব যে ভদ্রলোক হতে গেছিলি, এখন আবার ফিরে এলি কেন?"

ও আজ ওদের সঙ্গে যায়নি, যেতে ইচ্ছে করছিল না। সারাদিন খাওয়া হয়নি, মারের চোটে ঠোঁটের কোনা ফুলে আছে, ব্যথা। দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও বসে ছিল আর ভাবছিল নিজের ভাগ্যের কথা।

হঠাৎ কেউ ওর একটা হাত চেপে ধরতেই ও চমকে মুখ তুলল। পাপুকে দেখে ওর দু'চোখ বিস্ফারিত হল। কী মতলবে এসেছে? ওকে পুলিশে দেবে নাকি?

"ঘড়িটা পেয়েছি রে," নরম গলায় বলল পাপু।

"কোথায়?" রাধুর মুখ দিয়ে ফস্ করে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল।

"ওই কাকের বাসায়, কাকটাই নিয়েছিল।"

"তবে যে আমাকে মারলে—" দু'ঠোঁট কেঁপে উঠল।

"আমার অন্যায় হয়ে গেছে, চল্ তুই আমার সঙ্গে।"

"না," এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল রাধু, "আমি যাব না। তোমরা যখন ইচ্ছে করো আমাদের মাথায় তোলো আবার খুশিমতো পায়ে ঠ্যালো। আমার এখানেই ভাল।"

"আইসক্রিম খাবি রাধু?" একটা আইসক্রিমওয়ালাকে যেতে দেখে পাপু বলল।

"না, আমি কিছু খাব না।"

"তোর সারাদিন আজ খাওয়া হয়নি, না রে?" ওর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল পাপু।

"থাক্, তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না," রাধু ঝাঁঝিয়ে উঠল, "বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ, এখন ও কথায় দরকার কী তোমার।"

পাপু বুঝল ওর খুব অভিমান হয়েছে। ও একটু মাথা চুলকে বলল, "আমার পড়ার টেবিলটা না আবার ডাস্টবিন হয়ে গেছে, তুই না গেলে কে গোছাবে?"

"সে আমি কী জানি, আমি যাব না।"

"চল্ লক্ষ্মীটি, আর কখনও তোকে মারব না, আমি তিন সত্যি করছি।"

"সত্যি বলছ?" রাধু এবার ওর মুখের দিকে তাকাল।

"সত্যি বলছি, আর ওই ঘড়িটা তোকে আমি দেব।"

"ঘড়ি আমার চাই না।"

"তোকে নিতেই হবে, নইলে ওটা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

একটানে রাধুকে দাঁড় করাল পাপু, "জানিস, মা আমার ওপর খুব রাগ করেছেন, তোকে মিছিমিছি মেরেছি বলে। আমার আজকের পরীক্ষাটাও ভাল হয়নি—"

"ভাল হয়নি কেন? তুমি তো পড়াশোনা করেছিলে।"

"মানে মনটা ভাল ছিল না, তোর কথাই বারবার মনে হচ্ছিল। আর তুই রাগ করে থাকিস না। তোকে এবার স্কুলে ভর্তি করে দেব, বড় হয়ে তুই আমার সঙ্গে আমাদের ফার্মে কাজ করবি।"

"সত্যি বলছ!"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

"আবার কিছু হারিয়ে গেলে আমাকে চোর বলে দোষ দেবে না তো?"

"বলছি তো, না।"

এবার হাসি ফুটল রাধুর মুখে। "তবে চলো।"

ওরা দু'জনে হাঁটতে শুরু করল, রাধুর বাঁ হাতটা পাপুর ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা, ও যেন আর ওকে ছাড়তে ভরসা পাচ্ছে না।

ছবি : প্রবীর সেন

গান্ধীজির জন্য তাঁর আশ্রমে প্রতিদিন উপহার হিসেবে আসত নানা রকমের ফল। তাই দেখে একদিন এক ইংরেজ মহিলা বললেন, অমন চমৎকার আহারের লোভে তিনি ঋষি হতেও রাজি। গান্ধীজি সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন, "আহার্য বদলাবার জন্য অত উপরে উঠতে হবে না আপনাকে।"

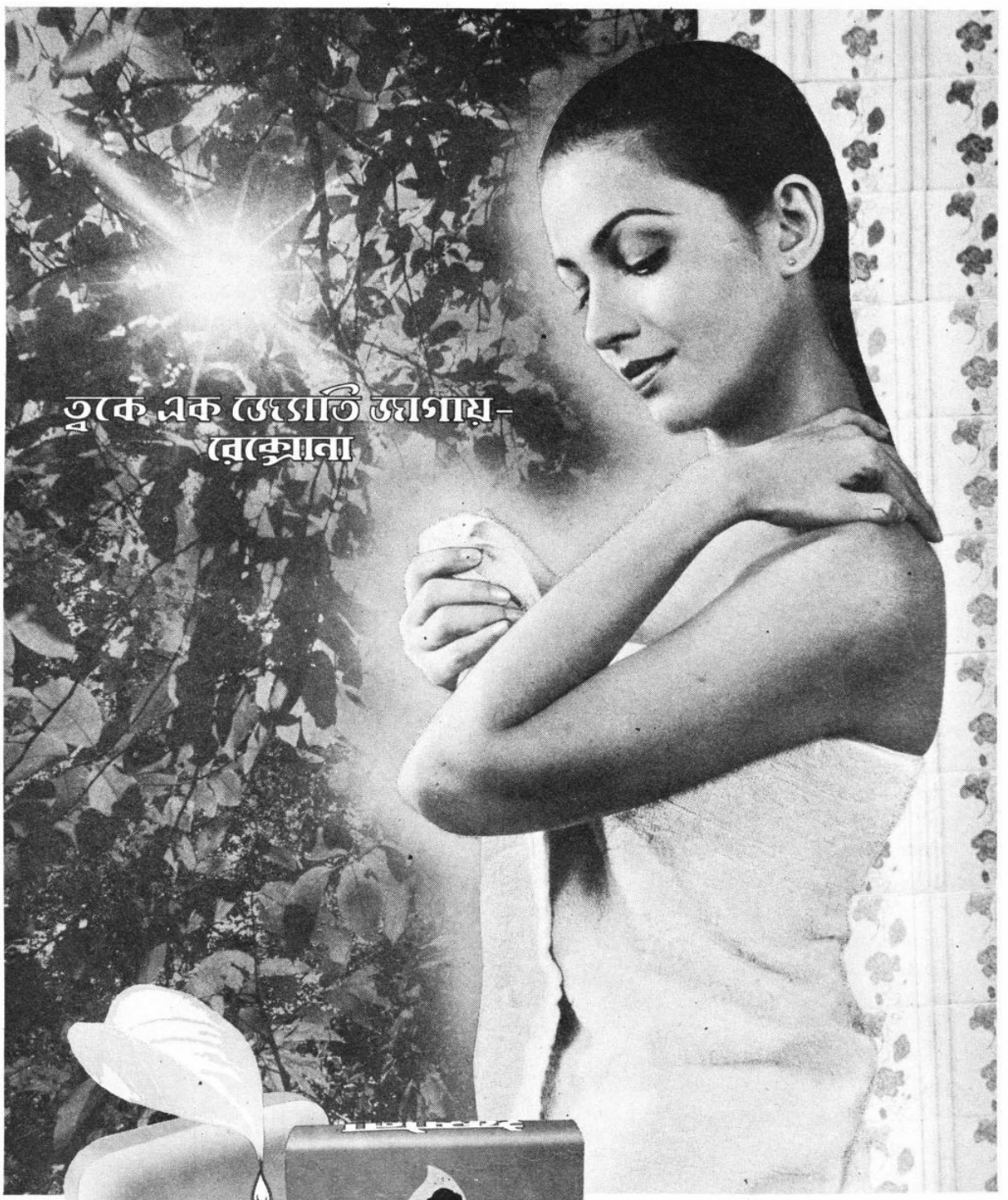

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

পুতুলদির মুখটা ভাসছে চোখের সামনে...

ভূতের মতোই

হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভজুমামাকে দেখেই বাবা লাফিয়ে উঠেছেন, "আরে এসো এসো ব্রাদার। উঃ, কী ঝামেলা থেকে যে বাঁচালে, কী বলব !"

"যা বলেছ," কথাটা প্রায় বাবার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে মা বললেন, "আমি তো এতক্ষণ ভেবেই পাচ্ছিলাম না কী করব।"

"ভাবনা-চিন্তার আর কিছু নেই," বাবা বললেন, "ভজু রইল, এবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে আসতে পারি। নাও নাও, তৈরি হয়ে নাও। তা হলে আজ রাতের মতো বডি ফেলে দাও ভায়া, আমরা ঘুরে আসি !"

ভজুমামার মাথা এতক্ষণ এদিক-ওদিক করা টেবিল-ফ্যানের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল একবার বাবা একবার মা'র মুখের দিকে। একটুখানি ফুরসত পেতেই বললেন, "ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !"

"আর বলিস না," মা বললেন, "খুকুর মেয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছে, শুনছি নাকি এখন-তখন অবস্থা।"

"ছোড়দির মেয়ে ? মানে, পুতুল ?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, হায়ার-সেকেণ্ডারি দিল এবার। মনে নেই, খুব সেন্টের বাতিক রে, তুই গেলেই জিজ্ঞেস করত বিলিতি সেন্ট এনেছিস কি না।"

"আরে দূর, মনে থাকবে না কেন ? শিমুরালি কি আমি কম গিয়েছি নাকি ! তা ব্যাপারটা হয়েছে কবে ?"

"কবে মানে ? আজই বিকেলবেলা। এই তো একটু আগে ফোনে খবর পেলাম। এতক্ষণ আছে না গেছে তাই বা কে জানে।"

"ইশ্, মনটা খারাপ করে দিলে তো দিদি ! যান যান জামাইবাবু, বেরিয়ে পড়ুন। আর দেরি করবেন না।"

"আরে সেই নিয়েই তো সমস্যা হচ্ছিল ভায়া," বাবা বললেন, "আকাশের অবস্থা দেখেছ ? যদি ফিরতে না পারি ! কাল থেকে আবার বিলটুর পরীক্ষা। ওকে তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"তাতে কী হয়েছে ? থাক তো একা," এতক্ষণে আমার ওপর নজর পড়েছে ভজুমামার, "বিলটু তো দেখছি রীতিমত জেন্টলম্যান হয়ে গেছে, একা থাকতে ওর ভয়টা কিসের শুনি ?"

ভয় যে সত্যিই পেয়েছিলাম সে কথা আর অস্বীকার করি কী করে ! এত বড় বাড়িতে একা থাকা যায় নাকি ! কিন্তু ভজুমামার মতো বক্সারের কাছে কি সে কথা কবুল করা যায়। সত্যি কথা বলতে কী, ভজুমামা আমার কাছে অরণ্যদেব বা টারজানের চেয়ে কম প্রিয় নয়। দেখা অবশ্য হয় খুবই কম, ধূমকেতুর মতো মাঝে-মাঝে হুট-হাট করে আসেন আবার কোথায় উধাও হয়ে যান। কতক্ষণই বা থাকেন এলে ! আসলে এক জায়গায় বসে থাকলে তো আর চলে না, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিংয়ের জন্যে ডাক পড়ে ভজুমামার। সারা বছরই ব্যস্ত। মা বলেন, ভজুমামা নাকি মা'র চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট, কেউ বলবে সে কথা ভজুমামাকে দেখলে। এখনও নাকি একদমে হাজার স্কিপিং করেন সকালবেলা।

আমি কিছু বলার আগেই মা বললেন, "যাক গে, শোন্, আর দেরি করব না। ঝড়জল আসার আগে অন্তত স্টেশনে তো পৌঁছই। রান্না তো করাই আছে, যখন, খুশি খেয়ে নিস। যত সকালে পারি ফিরে আসব।"

বাবা হেসে বললেন, "তোমার দিদি তো কেবল রাতের খাবারের কথা বললেন, আমি তোমাকে এখন একটা খাবারের সন্ধান দিই। ফেরার সময় দু-ডজন গাছপাকা মর্তমান নিয়ে এসেছি, যখন খুশি সাবড়ে দিও।"

"সত্যি ?" ভজুমামা হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে এমনভাবে তাকালেন যে, বোঝা গেল তিনি কেবল ভাল

মুষ্টিযোদ্ধা নন, যোগ্য কলারসিকও সেইসঙ্গে।

আসব-আসব করে বৃষ্টিটা এল শেষপর্যন্ত রাত এগারোটা নাগাদ। সঙ্গে ঝড়ও নেহাত মন্দ নয়। ক'দিন ধরে যা গুমোট চলছে, একটু ঠাণ্ডা হল তবু। দশটার মধ্যেই অবশ্য খেয়েটেয়ে নিয়েছি আমরা, পড়াশুনোর পাট আমার তার আগেই সারা। ভজুমামা খাটের ওপর জমিয়ে বসে এমন-সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে যাচ্ছিলেন যে, সময়টা কেমন করে কেটে গিয়েছে বুঝতে পারিনি।

তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করতে করতে বললাম, "তোমার সাহসের গল্প তো শুনলাম ভজুমামা, এবার একটা ভয় পাওয়ার গল্প বলো।"

"ভয় পাওয়ার গল্প?" ভজুমামা নড়েচড়ে বসলেন।

"হ্যাঁ। তুমি যাকে ভয় পাও এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে।"

"আছে, থাকবে না কেন," ভজুমামা মুচকি হেসে বললেন, "আমি ভয় পাই যাদের চোখে দেখা যায় না তাদের।"

"মানে?" আমি একটু আমতা-আমতা করে বললাম, "ভূত?"

"ওই, ভূতই বল আর আত্মাই বল, একই ব্যাপার।"

"দূর, ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি!" আমি হাসবার চেষ্টা করলাম, "বাবা বলেন, ভূত-টুত ওসব বাজে কথা।"

"বলেন বুঝি!" ভজুমামা হাসলেন, বললেন, "কিন্তু আমি যে একবার তাঁকে নিজের চোখে দেখেছি!"

সেরেছে! এই রাতদুপুরে ভজুমামা ভূতের গল্প শুরু করবেন নাকি! কিন্তু ভজুমামার গল্প, লোভ ছাড়া যায় না। বললাম, "কী দেখেছ শুনি।"

"না, তেমন কিছু নয়," ভজুমামা বললেন, "তুই মিকিমতোর নাম শুনেছিস? জাপানি বক্সার?"

আমার মুখ দেখেই ভজুমামা বুঝতে পেরেছিলেন আমি তার নাম শুনেছি কি না। তাই এক পলক আমার মুখের দিকে চেয়ে নিয়েই বলতে লাগলেন, "ওরা অবশ্য জুডো-ক্যারাটেতেই খুব নাম করেছে, তবু জাপানে যে ক'বার গিয়েছি ওরই সঙ্গে প্র্যাকটিস করতাম। দারুণ লড়ত লোকটা। ভালওবাসত খুব আমায়। শেষ যেবার যাই তখন খুব অসুস্থ ও, আমি গিয়ে দেখেও এসেছিলাম। একদিন হয়েছে কী বুঝলি —এইরকম রাতই হবে, শুয়ে পড়ার তোড়জোড় করছি, এমন সময় মিকিমতো এসে হাজির। একেবারে লড়ার পোশাকে! কী ব্যাপার, না একটু লড়তে চাই তোমার সঙ্গে। কত করে বোঝালাম, শুনলে না। দাঁড়াতেই হল শেষপর্যন্ত। আর তখনই ঘটল সেই দারুণ ব্যাপারটা।"

"কী হল, তুমি হেরে গেলে?"

"আরে দূর, সেটা কি একটা লড়াই হল নাকি! যতবার ঘুসি চালাই—নির্ঘাত গিয়ে লাগার কথা ওর গালে-নাকে-চোয়ালে, অথচ ঘুসি বেরিয়ে যাচ্ছে ওর মুখের ভেতর দিয়ে। মিনিট-কয়েকের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠলাম আমি। এমনি করে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করা যায় নাকি! সেই তোদের সুকুমার রায় না কার একটা কবিতা আছে না, ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা, আমার হল সেই অবস্থা।"

"তারপর?" আমি উৎসাহে একেবারে কাছে সরে এসেছি তখন।

"তারপর আর কী," বুঝিয়েসুঝিয়ে কোনওরকম করে তো বাড়ি পাঠালাম ওকে। সকালেই খবর পেলাম, গত রাত্রেই নাকি ও মারা গিয়েছে।"

"সে কী! তা হলে তুমি কার সঙ্গে লড়লে?"

"সেইটেই তো কথা! পরে বুঝতে পারলাম, আত্মা তো আর মরে না, আমায় ভালবাসে, তাই আমার কাছেই ছুটে এসেছে। সেই জন্যেই তো বললাম, চোখে না দেখলে হয়তো—"

এমনিতেই বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল, সুযোগ বুঝে সেই মুহূর্তে আলোটাও নিবে গেল হঠাৎ।

লোডশেডিং। এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়, তবু আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছি ভজুমামার গায়ে।

"এই দ্যাখো, ভয় পেলি নাকি?" ভজুমামা আমার পিঠে হাত রাখলেন, "দূর বোকা, ওঠ ওঠ, টর্চটা কোথায় রেখেছিস, দে।"

মনে পড়ল টর্চটা বিছানাতেই আছে, বালিশের পাশে। হাতড়ে বার করলাম। টর্চ জেলে ভজুমামা বললেন, "দাঁড়া, একটা জানলা খুলে দিই, গরম লাগছে। বাথরুম যাবি?"

পাগল! সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "না না, দরকার নেই।"

একটা জানলা খুলে ফিরে এলেন ভজুমামা। বাইরে ঝড়ের দাপট সমানে চলছে। একটা বালিশ টেনে নিয়ে বললেন, "এবার তা হলে শুয়ে পড়া যাক, কী বলিস! মনটাও একটু চঞ্চল হয়ে আছে, ভাল লাগছে না।"

"কেন?"

"ওই পুতুলটার জন্যে। এ-রকম করে ট্রাংককল করার মানে কী হতে পারে!"

"কী বলো তো?"

"কী আবার!" ভজুমামা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন, "বড় ভাল ছিল রে মেয়েটা! যাক, ওসব আর ভাবতে হবে না, ঘুমো দিকি।"

বললেন তো ভজুমামা, কিন্তু ঘুম কি আর অত সহজে আসে! পুতুলদির মুখটা ভাসছে চোখের সামনে। ভজুমামা যা বললেন তা সত্যি হলে পুতুলদি আর বেঁচে নেই। ইশ্, গত পুজোতেও আমাদের বাড়ি এসে কতদিন থেকে গিয়েছে।

ভজুমামার আর কোনও সাড়া নেই। ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বাইরে ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজ।

আচ্ছা, আত্মাটাত্মা বলে সত্যিই কি কিছু আছে? তারা যাদের ভালবাসে তাদের কাছে আসে? পুতুলদি তো মাকে ভীষণ ভালবাসত, আমাকেও ভালবাসত। তা হলে!

শিরদাঁড়ার ভেতরটা কেমন কনকন করে উঠল। ভজুমামার গা ঘেঁষে সরে এলাম।

দূর, কী সব ভাবছি আবোলতাবোল! ভজুমামার মতো একজন লোক শুয়ে আছেন পাশে, আর আমি কিনা—

নাঃ, ঘুমোনো দরকার। পরীক্ষা বলে আমি গেলাম না বাবার সঙ্গে, সে কি এমনি করে জেগে রাত কাটাব বলে! এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল বোধহয়, হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল।

প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু তারপরই নাকে এল গন্ধটা। মৃদু, অথচ ভারী মিষ্টি। সমস্ত ঘরে যেন ছড়িয়ে আছে।

মনের ভুল ? জোরে-জোরে শ্বাস টানলাম দু'বার। নাঃ, তা তো নয়। সত্যিই তো আছে গন্ধটা। অথচ এতক্ষণ আমরা কেউই—

পুতুলদি খুব সেন্ট ভালবাসত, কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। মনে হতেই সারা শরীরটা যেন শিরশির করে উঠল। ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই আমি চোখ খুললাম।

জমাট অন্ধকার। চোখ খুলেও যা, না খুলেও তা। হাত বাড়িয়ে ভজুমামার একটা হাত পেয়ে গেলাম। একবার ভাবলাম ডাকি, কিন্তু ভীষণ লজ্জা হল, ছিঃ, ভজুমামা কী ভাববেন আমাকে। মনে জোর আনবার জন্যে আমি মনে মনে নিজেকে ভিতু-টিতু এই সব যা-তা বলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর কী!

কিন্তু ঘুমই যে ছাই আসে না! যত সব আজেবাজে কথা ঘুরঘুর করছে মাথার মধ্যে। তাছাড়া ওই গন্ধ, মনকে এত বুঝিয়েও তো গন্ধটা সরাতে পারলাম না ঘর থেকে! চোখ বন্ধ করে মন একটু অন্য দিকে দেবার চেষ্টা করলাম। ঝড়জল সমানে চলেছে। কাল সকাল পর্যন্ত নিশ্চয়ই চলবে না। কাল ইংরেজি পরীক্ষা, ইংরেজিটা আবার আমার—

বুকের রক্ত হঠাৎ ছলাত করে উঠল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল মুহূর্তে!

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্!

চুড়িপরা হাত নড়লে-চড়লে যেরকম শব্দ হয়, ঠিক সেই শব্দ। চোখ বুজেও যেন আমি মেঝেতে হালকা পা ঘষার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কার নিশ্বাস যেন ফোঁস-ফোঁস করছে ঘরের মধ্যে।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। বুকে কে যেন একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘামে শরীর জবজব করছে। কোনওরকমে আড়ষ্ট হাত নেড়ে ভজুমামাকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করলাম। হাতে ঠেকল টর্চটা। কোনও কিছু না ভেবে টর্চের বোতাম টিপলাম। দম-বন্ধ-করা অন্ধকার চিরে এক ঝলক উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়ল দরজার ওপর। আর—

সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক খাবলা বরফগলা জল কে যেন ছুঁড়ে মারল মাথায়! চোখের সামনে আগুনের মতো ঝকঝক করে উঠল দরজার ফাঁকে শাড়ির আঁচলটা!

নিজের অজান্তেই কখন যে গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে, কতক্ষণ যে ওই রকম আচ্ছন্নের মতো কাটিয়েছি ঠিক জানি না, খেয়াল হল ভজুমামার ঝাঁকুনি খেয়ে। এক হাতে টর্চ ধরে ভজুমামা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলছেন, "কী রে, বিলটু, এই! ওরকম করছিস কেন?"

আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে একটু সময় লাগল। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না তখনও। কোনওরকমে বললাম, "পুতুলদি!"

"পুতুল? তার মানে?"

"এই ঘরে এসেছে!" আমি ফিসফিস করে বললাম, "ওর চুড়ির আওয়াজ পেয়েছি আমি, সেন্ট তুমি এখনও পাবে, তা ছাড়া—"

"কী তা ছাড়া?"

"দরজার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, পুতুলদির শাড়ির আঁচল।"

ইয়ারমার্ক

ইংরেজি 'ইয়ারমার্ক' কথাটা তোমরা শুনেছ নিশ্চয়? কথাটার অর্থও নিশ্চয় অনেকেই জানো? টাকাপয়সা কিংবা অন্য কোনও-কিছু যখন নির্দিষ্ট কোনও প্রয়োজন মেটাবার জন্য আলাদা করে রাখা হয়, তখন বলা হয়, ওই কাজের জন্যে এটা 'ইয়ারমার্ক' করা রইল। বানানটা হল **earmark**। *তা, মার্ক কথাটার তাৎপর্য নাহয় বোঝা গেল, ইয়ার অর্থাৎ কানের ব্যাপারটা এর মধ্যে ঢুকল কী করে? সেটাই তো মজা। গোরু, ভেড়া ইত্যাদি জন্তুজানোয়ারের মধ্যে কোন্‌টা কার, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে তাদের মালিকরা একই কালে গৃহপালিত এইসব প্রাণীর কানে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখত, ঠিক যেমন রুমাল, গেঞ্জি ইত্যাদিতে অনেকে চিহ্ন দিয়ে রাখেন। তারপর কালে-কালে যে-কোনও ব্যাপারে কিছুকে চিহ্নিত করাকেই লোকে বলতে লাগল ইয়ারমার্ক করা। মাস-মাইনের একটা অংশকে যখন আমরা বই কেনার জন্যে ইয়ারমার্ক করে রাখছি, তখন—কানের সঙ্গে যদিও সম্পর্ক নেই—আসলে আমরা বোঝাতে চাইছি যে, মাইনের এই অংশটা বই কেনার জন্যে চিহ্নিত রইল।*

ভজুমামা কথা না বলে টর্চটা ঘোরাল দরজার দিকে, এবং সেই মুহূর্তেই কারেন্ট চলে এল। ঝকঝকে আলোয় চোখ একেবারে কানা হয়ে গেল যেন। পর মুহূর্তেই একটা বাজখাঁই হাসির শব্দে চোখ খুলতে হল।

"ছি ছি, তুই কী রে বিলটু," ভজুমামা তখন এগিয়ে গিয়েছেন দরজার কাছে। চোখ খুলে উজ্জ্বল আলোয় ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পেরেছি।

কিছুই না, দরজার বাইরে যে পর্দা ঝুলছিল, দরজা বন্ধ করবার সময় তার একটুখানি ভেতরে ঢুকে গিয়েছে।

"তাহলে এই হল পুতুলের শাড়ি, কী বল?"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "কিন্তু ওর চুড়ির শব্দ? সেটা তো আর মিথ্যে নয়।"

"হুঁ," ভুরু কুঁচকে খানিক এদিক-ওদিক চাইলেন ভজুমামা, তারপর পাল্লা না-দেওয়া দেওয়াল-আলমারির সামনে গিয়ে বললেন, "এই যে তোর চুড়ির শব্দ।"

ঝড় থেমে গিয়েছে, অল্প হাওয়া আছে, তাতেই ঝোলানো হ্যাঙ্গারগুলো দুলছে অল্প-অল্প।

"আর গন্ধ?" মরিয়া হয়ে আমি বললাম।

"সেটাও খুঁজে বার করা যাবে নিশ্চয়ই," মেঝেয় পায়চারি করতে করতে শেলফ থেকে ঝট করে একটা খালি সাবানের মোড়ক টেনে নিলেন ভজুমামা, "দ্যাখ তো এই গন্ধ কি না।"

ঠিক। দামি সাবানটা আজ সকালেই ভাঙা হয়েছে, মনে ছিল না। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলাম, ভজুমামা বললেন, "আমারই ভুল হয়েছিল তোকে ওইসব গল্প শোনানো। নে নে, শুয়ে পড়, কোনও ভয় নেই। বলিস তো না-হয় আলোটা জ্বালাই থাক।"

এবার সজোরে ঘাড় নেড়ে বললাম, "না, নিবিয়েই দাও।"

একটু আগেই ফিরে এসেছেন বাবা-মা। রাত দুটো অবধি যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছে। এখন ভাল আছে পুতুলদি। ডাক্তাররা বলেছেন: আর কোনও ভয় নেই।

ছবি: অনুপ রায়

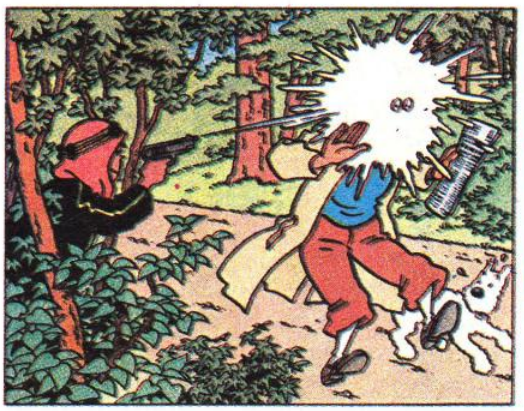

আবদুল্লা! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি !
হাহা !
হাহা !

ব্যাপারটা যে কত ভয়ঙ্কর, আবদুল্লার তা বোঝার বয়েস হয়নি !

গুড়ুম
?!

পাজি নচ্ছার ছেলে ! বাঁদরটা আমার ইজিচেয়ারের নীচে পটকা রেখে দিয়েছিল! ওকে আজই ফেরত পাঠাব !
তা আর সম্ভব নয়···

খেমেদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান
রাজধানী বিদ্রোহীদের হাতে
আকাশ থেকে বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালিয়েছিল কিন্তু জঙ্গি বিমান সরবরাহ করল কে

আমির বেন কলিশের এ কী সর্বনাশ হল ! চিঠিতে তিনি এরই কথা লিখেছিলেন । না, আবদুল্লাকে সত্যি ফেরত পাঠানো যাবে না !
কিন্তু···

আবদুল্লার বদলে আমরাই চলে যেতে পারি !
ঠিক বলেছ ! কোথায় যাব বলো তো ?

খেমেদে গেলে কেমন হয় ?
চমৎকার হয় !

অ্যাঁ, খেমেদে ? এই সময় ? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

আমিরের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে । তা ছাড়া, বিমানের এই ব্যাপারটারও একটা ফয়সলা হওয়া দরকার ।
না, না, আমি যাচ্ছি না ! কিছুতেই না ! কভি নেহি !

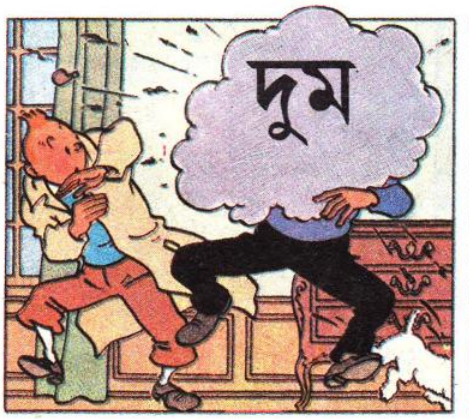
দুম

বেশ, যাওয়াই যাক !

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

মেলচেস্টার রোভার্স

রোভার্সকে দশজনে খেলতে হচ্ছে এবার

ফ্রিটে আজ চূড়ান্ত খেলা জারকাডির সঙ্গে। অথচ রোভার্স দলের বেশ-কিছু খেলোয়াড় অসুস্থ। দলে আছে তিনজন জুনিয়র খেলোয়াড়, স্থানীয় বালক জর্গো ডিমুকেও দলে নিতে হয়েছে। খেলার মধ্যেই প্যাকো ডিয়াজ বসে পড়ল!

উঃ!

গোলে বল ঠেলতে গিয়ে প্যাকো বসে পড়ল!

কী হল প্যাকো!

ট্রেনার ট্যাফি মর্গান ছুটে এলেন...

পেটে ভীষণ ব্যথা!

কাল রাতে রাক্ষসের মতো গিলেছ!

ব্যথা তো হবেই!

রোভার্স এবার বিপদে পড়বে!

বদলি-খেলোয়াড়ও আর নেই।

ভিড়ের মধ্যে বসে আছে চক্রান্তকারী!

এই তো শুরু!

আরও খেলোয়াড় অসুস্থ হবে!

প্রচণ্ড চাপ পড়েছে রোভার্সের উপরে...

বেরিয়ে যা!

চার্লি জোর বাঁচিয়েছে!

কিন্তু বল যে ফিরে এল!

গোল হবেই!

জগো বল ক্লিয়ার করে দিল

শাবাশ জর্গো!

আরে!

আপনি আমাকে এগিয়ে খেলতে বলেছিলেন !
ভাগ্যিস আমার কথা শোনোনি !
শাবাশ !
পাল্টা-আক্রমণে উঠে এসেছে রোভার্স···
একটুর জন্যে গোল হল না !
রয় সত্যি বড়-খেলোয়াড় !
হঠাৎ···
আরে, প্যাকো আবার নামছে !
দেখে মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ সুস্থ !
গ্যালারির দিকে তাকিয়ে আছে রয় !
আর কেউ অসুস্থ হচ্ছে না দেখে কেউ-একজন নিশ্চয় খুব উদ্বিগ্ন !
প্যাকো ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে···
এগোও রয় !!
দাও আমাকে ! এগোচ্ছি !
জর্গোও উঠে এসেছে···
রয় জর্গোকে বল ঠেলেছে !
জর্গো বল ধরছে !
গো-ও-ও-ও-ল !
দারুণ গোল দিয়েছে জর্গো !
জর্গো !
জর্গো !
এ-ছেলেটাকে আমাদের টিমের স্থায়ী খেলোয়াড় হিসেবে নিতে হবে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
চক্রান্তকারীর পরিচয় এবারে ফাঁস হতে চলেছে

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

LINTAS BIN MB 12 2720 BG

ও এমন কিছু নয়, ওর জামাটা হলুদ করে দিন

তিন-কাণ্ড

কল্যাণ চক্রবর্তী

লক্ষ্মণবাবু দরকারি কাগজপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। লক্ষ্মণবাবু সপুকে বললেন, "দ্যাখো তো, কে এল।"

সপু নীচ থেকে ঘুরে এসে বলল, "বাবা, তোমাকে ডাকছেন।"

"ক'জন এসেছেন, দেখেছ?"

"দু'জন।"

লক্ষ্মণবাবু নীচে এসে দেখলেন, তিনজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। সঙ্গে-সঙ্গে সপুকে ডেকে বললেন, "দ্যাখো তো, আমরা এখানে ক'জন আছি।"

সপু চটপট জবাব দেয়, "চারজন।"

"ঠিক বলেছ। এবার আমাকে বাদ দিয়ে বলো তো, ক'জন?"

এবারও সপু চটপট জবাব দেয়, "দু'জন।"

এই দুই আর চার। এর মধ্যেই সপু ঘোরাঘুরি করছে। তিন কিছুতেই বলবে না। সেদিন অঙ্কের মাস্টারমশাই বলছিলেন, সপু অঙ্কে ভীষণ উইক।

লক্ষ্মণবাবু মাস্টারমশাইয়ের কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি ভেবেছিলেন, সপু এমনিতে তো লেখাপড়ায় খারাপ নয়, অঙ্কে নিশ্চয়ই তেমন মন দেয়নি। তাই গোলমাল করছে। ও ঠিক হয়ে যাবে।

পরীক্ষার ফল বেরুল। বরাবর ফার্স্ট-হওয়া ছেলে ফাইভ থেকে সিক্সে উঠল অঙ্কে যা-তা নম্বর পেয়ে। অঙ্কের জন্য আলাদা মাস্টারমশাই রাখা হল, কিন্তু কোনও ফল হল না। মাস্টারমশাই বললেন, "সপু তিন সংখ্যাটা নিয়েই গোলমাল করছে। কোনও কিছুর যোগফল তিন হলে হয় দুই বসাচ্ছে, নয়তো চার। কিন্তু কিছুতেই তিন বসাচ্ছে না। তিন নিয়েই যত বিভ্রাট।"

অদ্ভুত কাণ্ড! বিস্তর রোগের কথা শুনেছেন লক্ষ্মণবাবু, কিন্তু এমন বিচ্ছিরি রোগের কথা তো তিনি শোনেননি। সব বিষয়েই সপু ভাল। সময়মতো স্কুলে যায়। খেলাধুলো করে। হোমটাস্কে কখনও ফাঁকি দেয় না। কিন্তু অঙ্কের কথা উঠলেই আনমনা হয়ে যায় সপু। সব উলটো-পালটা করে ফেলে।

একটু চিন্তিত মনে লক্ষ্মণবাবু পাড়ার হরিডাক্তারের কাছে গেলেন। তাঁকে সপুর কথা বলতেই তিনি হেসে কুটিপাটি। বললেন, "লক্ষ্মণবাবু, আপনি নিশ্চয়ই অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলেন। ছেলে আপনার ধাত পেয়েছে।"

হরিডাক্তার মিথ্যে বলেননি। লক্ষ্মণবাবু অঙ্কে বরাবর কাঁচা। অঙ্কের ভয়ে তাঁর পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি বটে, কিন্তু এমন তিন-কানা ছিলেন না।

ক'দিন ধরে লক্ষ্মণবাবুর মনটা একদম ভাল নেই। নিয়মিত অফিস যাচ্ছেন আসছেন, কিন্তু কোনও কাজে মন বসাতে পারছেন না। সব সময়ই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছেন তিনি। একমাত্র ছেলে সপুকে নিয়ে কী ঝামেলাতেই না তিনি পড়েছেন!

লক্ষ্মণবাবুর সহকর্মী রাসবিহারীবাবু একদিন সপুর কথা শুনলেন। তিনি খুব মানী-গুণী লোক, কম কথা বলেন, বয়সেও লক্ষ্মণবাবুর চেয়ে বড়। সব শুনেটুনে তিনি বললেন, "ওকে ভূতে ধরেনি তো? ওঝা-টোঝা দেখিয়েছ?"

লক্ষ্মণবাবু ভূতের কথা শুনে একটু আশ্চর্য হলেন। ভূত তো গাছে থাকে। কলকাতায় যখন প্রচুর গাছগাছালি ছিল, এত লোকজন ছিল না, তখন নাকি ভূতেরা একটু-আধটু দৌরাত্ম্য করত। এখন চারদিকে লোক গিজগিজ করছে। এত

গাড়িঘোড়া, এত বিজলিবাতির আলো, আর গাছপালা যা আছে তা তো হাতে গোনা যায়, ভূত আসবে কোত্থেকে।

লক্ষ্মণবাবু চুপ করে আছেন দেখে রাসবিহারীবাবু বললেন, "ওসব ভূত-টুত আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এমন একটা ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি যে, ভূতে এখন আর বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

লক্ষ্মণবাবু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বললেন, "নাহ্, ওঝা-টোঝা দেখাইনি। তবে ডজনখানেক ডাক্তার দেখিয়েছি। আচ্ছা, ওঝা কোথায় পাব বলতে পারেন?"

"আজকালকার ওঝাও ডাক্তার কোবরেজের মতো। ওঝার জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হবে। বারাসাত স্টেশনে নেমে যাকে জিজ্ঞেস করবে, সে তোমাকে পাঁচ-সাতজন ওঝার সন্ধান বলে দেবে।"

"বারাসাত ছুটতে হবে," লক্ষ্মণবাবু বললেন, "ওঝা কলকাতায় পাওয়া যাবে না?"

"ওঝা ধরতে হলে গ্রামে যাওয়াই ভাল। অজ পাড়াগাঁয় কলকাতার মতো ডাক্তার নেই। ওখানে একটু-আধটু অসুখ হলেও ওঝা ডাকে। আমাদের বাড়ির পাশেই একজনের বাড়িতে ওঝা এসেছিল। তার কাণ্ডকারখানা আমি দেখেছি। গায়ে আলখাল্লার মতো বিচিত্র একটা পোশাক, মুখে খিক-খিক হাসি। তার বয়সের গাছপাথর নেই। ওঝা দরজায় পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিকট আঁশটে গন্ধ। সেই গন্ধে কীরকম যেন মাথাটাথা গুলিয়ে গেল। এই গন্ধে ভূত বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। কারণ সব ভূত তো আর ভিখিরি নয়, ওদের মধ্যে খানদানি ভূতও আছে যে।"

লক্ষ্মণবাবু ভাবলেন, এখন সপু তিন ছাড়া কাজ চালাচ্ছে, ওঝার গন্ধে হয়তো সবই ভুলে যাবে।

লক্ষ্মণবাবুকে কথা বলতে না দেখে রাসবিহারীবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তোমার যখন ওঝায় বিশ্বাস নেই সামনের রোববার তোমার কাছে একজনকে পাঠিয়ে দেব।"

"কাকে পাঠাবেন? ডাক্তার না ওঝা?"

লক্ষ্মণবাবুর কথা শুনে মৃদু হাসলেন রাসবিহারীবাবু। "আরে না, না, ওসব কিছু নয়। যাকে পাঠাব, সে তোমার খুব পরিচিত। আমাদের পুরনো এক লোক। সকালবেলা তাকে পাঠিয়ে দেব।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন লক্ষ্মণবাবু। এবার নিশ্চয়ই একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবে। ডাক্তার-বদ্যি আর ওষুধপত্রে জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই একটা ফর্দ ধরিয়ে দেয়। এটা করো, ওটা করো। এত করেও ছেলেটা যে-কে-সেই।

রবিবার সকালে একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠলেন লক্ষ্মণবাবু। চা খেয়ে সবে কাগজটা নিয়ে বসেছেন, সপু এসে বলল, "বাবা, তোমাকে ডাকছে।"

কিছুক্ষণ বাদে লক্ষ্মণবাবু নীচে নেমে এসে দেখলেন, হ্যাঁ, পরিচিত লোকই বটে। একসময় তাঁর অফিসে নিত্য যাতায়াত করত। অনেক ভেবেও লোকটির নাম মনে করতে পারলেন না লক্ষ্মণবাবু।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটি সপুর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে, যেন সপু তার কত দিনের চেনা!

লক্ষ্মণবাবুকে দেখে লোকটি উঠে দাঁড়াল। "দাদা, আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

"বিলক্ষণ। কিন্তু নামটা বাপু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

"নাম আর কী করে মনে থাকবে বলুন? অনেকদিন যাতায়াত নেই যে। আমার নাম বিলাস।"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তারপর কেমন আছেন বলুন।"

বিলাস হাঁ-হাঁ করে উঠল, "আপনি নয়, আমাকে 'তুমি' বলুন।"

একটু হেসে লক্ষ্মণবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।" তারপর সপুকে বললেন, "যাও, ভেতরে গিয়ে বলে এসো দু' কাপ চা পাঠাতে।"

সপু ভেতরে চলে যাওয়ার পর বিলাস বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো দাদা? রাসবিহারীবাবুর মুখে শুনেছি, তবু আপনি সবটা বলুন।"

আদ্যোপান্ত শুনে বিলাস বলল, "এটা ডাক্তার-বদ্যি বা ওঝা-টোঝার ব্যাপার নয়। বলতে পারেন এটা আমারই ব্যাপার। আমি এই কেস্‌টা হাতে নিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করবেন না।"

সপু আবার ভেতরে ঢোকায় আলোচনায় ছেদ পড়ল।

লক্ষ্মণবাবুর কাছে বিলাসের কথা ধাঁধার মতো মনে হল। ডাক্তার ওঝার কাজ নয়, তা হলে এটা কার কাজ! কীভাবে রোগ সারবে! বিলাসের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন দেখা নেই, তা হলে কি সে এরই মধ্যে যোগবলে কোনও আশ্চর্য ক্ষমতা আয়ত্ত করে ফেলেছে! আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

বিলাস সপুর কাছ থেকে সাদা কাগজ নিয়ে বিভিন্ন নম্বর বসিয়ে যোগ দিতে লাগল।

ছুটির দিন। লক্ষ্মণবাবুর কোনও তাড়া নেই। কিন্তু একবার বাজারে যাওয়া দরকার। বিলাস কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে! কিন্তু তাকে তো আর চলে যেতে বলা যায় না।

বিলাস কী সব যোগ-টোগ করে বলল, "আচ্ছা দাদা, ওর জন্মদিন কি বেস্পতিবার?"

"হ্যাঁ।"

"তিন তারিখে?"

"হ্যাঁ।" হাসি ফুটে উঠল লক্ষ্মণবাবুর মুখে।

"আপনার বাড়ির নম্বর কি তিন?"

"না।"

"কত বলুন তো?"

"বারো।"

এবার বিলাস হেসে ফেলল। "বারো মানে তো তিন-ই। এই দেখুন এক আর দুইয়ের যোগফল তিন। ওর স্কুলবাড়ির নম্বরটা কত?"

"তা তো বলতে পারব না।"

কথা বলতে বলতে বিলাস ব্যাগ হাতড়ে নানা রঙের কয়েকটা কাগজ বার করে টেবিলে রাখল।

বিলাসের আসল মতলবটা কী, বুঝতে পারছিলেন না লক্ষ্মণবাবু। সকালবেলা সপুর সঙ্গে খেলা করতে এসেছে নাকি!

বিলাস সপুকে বলল, "যে রঙটা তোমার পছন্দ, তুলে নাও।"

সপুও ব্যাপার-স্যাপার দেখে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। সে কী করবে বুঝতে পারছিল না।

মৃদু ধমক দিল বিলাস। "কী হল, নাও।"

সপু ধমক খেয়ে একটা কাগজ তুলল।

বিলাস সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "দেখলেন, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই।" বিলাস সপুর হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে লক্ষ্মণবাবুর চোখের সামনে তুলে ধরল।

লক্ষ্মণবাবু বিলাসের কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিলেন না। এক টুকরো হলুদ রঙের কাগজ, এর মানে কী!

"দেখলেন তো, ঠিক হলুদ তুলেছে," বিলাস বলল, "আমি নিউমারলজি মানে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে হিসেব করে দেখলাম, ওর রঙটা হলুদ। আর তিন হল বৃহস্পতির ঘর। ওর এখন একটু কালার-ট্রিটমেন্ট দরকার। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

লক্ষ্মণবাবু বললেন, "সে আবার কী!"

"ও এমন কিছু নয়। ওর জামাটা হলুদ করে দিন। ঘরের দরজা-জানালার পর্দাগুলোর রঙও পালটে হলুদ করে দিন। ব্যস্, এতেই হবে।" এই বলে বিলাস ব্যাগ থেকে টুক করে একটা পাথর বের করে লক্ষ্মণবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা সোনায় বাঁধিয়ে পরিয়ে দিন। আর কোনও চিন্তা নেই।"

তেরছা চোখে লক্ষ্মণবাবু পাথরটা দেখলেন। হালকা সবুজ রঙের পাথর। বেশ জ্বলজ্বল করছে। মনে হয় বেশ দামি। অবশ্য পাথর সম্বন্ধে লক্ষ্মণবাবুর কোনও ধারণাই নেই। এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। পাথর বেচার ব্যবসা করে বিলাস। লোককে উলটো-পালটা বুঝিয়ে পাথর গছিয়ে দেয়। কিন্তু এই পাথর দেওয়ার জন্য এত সময় নেবার কী দরকার ছিল? এসেই তো দিয়ে দিতে পারত। মনে হয়, বেশি দাম হাঁকার জন্য নানান গল্প ফেঁদেছিল। লোক ঠকাবার জন্য বাজারে যে কত রকম কল বেরিয়েছে! লক্ষ্মণবাবু মনে মনে বললেন, 'বাবা, দামটা নিয়ে এবার মুক্তি দাও। সুন্দর সকালটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।'

লক্ষ্মণবাবু মৌনী রয়েছেন দেখে বিলাস বলল, "বাজারে বেরুতে বোধহয় আপনার খুব দেরি হয়ে গেল। পাথরটা সোনায় বাঁধিয়ে পরিয়ে দিন। আমি এখন উঠি। সময়মতো আমি আবার চলে আসব, আপনাকে ভাবতে হবে না।"

বিলাস ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল।

"এ কী! তুমি উঠে পড়লে যে," লক্ষ্মণবাবু বললেন, "পাথরের দাম নেবে না?"

"না, না, দামটাম লাগবে না। পাথরটা আমার বাড়িতেই ছিল। আপনার যদি কোনও কাজে লাগে, এই ভেবে নিয়ে এলাম। পাথর বেচা আমার ব্যবসা নয়। আপনি ওটা নিশ্চিন্তে সপুর হাতে পরিয়ে দিন।" বলতে বলতে বিলাস হলুদ রঙের কাগজটা সপুর হাতে দিয়ে বলল, "বলো তো, ঘরে আমরা ক'জন?"

ফিক করে হেসে ফেলল সপু, "তিনজন।"

লক্ষ্মণবাবুর মনে হল, তিনি যেন ম্যাজিক দেখছেন।

"দেখলেন তো রঙের কী গুণ!" বলতে বলতে বিলাস দরজার দিকে পা বাড়াল।

ছবি : দেবাশিস দেব

আমি যাই মুরছো

সুদেষ্ণা সরকার

ঝাঁঝাঁ করে রোদ্দুর কাঠফাটা দুকুরে
ছিপ নিয়ে ডানপিটে কে বসেছে পুকুরে।
খাঁখাঁ করে মাঠঘাট, নেই লোকজন যে
হাওয়া বয় শনশন, থমথম মন যে।
গুটিগুটি পায়ে য়াই আঘাটার ধারেতে,
রোগাপানা কালো-হেন্ কে যে বসে পারেতে।
জুলুজুলু চোখে চেয়ে ফাতনার কলেতে,
এই আছে এই তার ছায়া নেই জলেতে।
চাউনিতে অদ্ভুত খাই-খাই মাখানো
মনে হল, দু পায়েই গোড়ালিটা বাঁকানো।
"ওহে মোড়লের পো," বলি গলা খাঁকরে,
"ভর রোদে লাভ কী হে পচা পানা পাকড়ে।
এঁদোজলে মিলবে না মাছ, গেঁড়ি-গুগলি
মাছ চাও, তবে যাও, দূর বনহুগলি।"
যেই বলা, অমনি সে, ভাবলেও কাঁটা দেয়!
এদিকেই হন্‌হন্ রনপায়ে হাঁটা দেয়।
হেসে বলে, এক মুখ দাঁত বের করিয়া,
"শেষমেশ মাছ খাব, নই এত মরিয়া।
মাছ মেলে ঢের, লোকই মেলে না যে, দূর ছো,
হাঁউ মাঁউ তোঁকে খাঁউ," আমি যাই মুরছো!

ছবি : দেবাশিস দেব

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে, আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।

জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই। আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

OBM/2193-BEN

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে এক মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের ভার নেন। সন্দিগ্ধ দুই ভাই পালিয়ে যে বাসে ওঠে, তাতে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। গজ-পালোয়ানের ডেরায় ঢুকে যে জখম লোকটি মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। উটকো লোকটার নাম আপাতত পঞ্চানন্দ। মধ্যরাতে তিনটে ছায়ামূর্তি শিবুবাবুর ল্যাবরেটারির দিকে এগোয়। পঞ্চানন্দ ন্যাড়াকে বলে, তারা গজ-কুস্তিগিরকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কবি হরিবাবুর বাজারের ভার পঞ্চানন্দ নিয়েছে। গজর ডেরায় গিয়ে একটা ফুটোয় কান রেখে সে রহস্যজনক শব্দ শুনেছে। তারপর···

ছেলেগুলো এসে পঞ্চানন্দকে একেবারে ঘিরে ধরল। ভারী লজ্জিত তারা। ষণ্ডামতো একটা ছেলে বলল, "পঞ্চানন্দদা, আমরা যে আপনার সঙ্গে বেয়াদপি করে ফেলেছি সে-কথা গজদাকে বলবেন না।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "আরে না। তোমরা সবাই বুঝি গজ'র ছাত্র ? বাঃ বাঃ। তা গজ একটু-আধটু কুস্তি শিখেছিল বটে শেরপুরে থাকতে। আমিই শেখাতুম। অবশ্য আসল-আসল প্যাঁচগুলো শেখানোর সময়ই তো পেলাম না। হিমালয় থেকে আমার ডাক এসে গেল কিনা। তবে শুনেছি, গজ বেশ ভালই লড়েটড়ে।"

ছেলেগুলো এ-কথায় মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। ষণ্ডাটা বলল, "তা হলে আপনিই কেন আমাদের আজ একটু তালিম দেন না !"

পঞ্চানন্দ জিব কেটে বলল, "ও বাবা, গুরুর বারণ। ঠিক বটে, এক সময়ে যারা ধর্মকর্ম করত, তারাই নানারকম শারীরিক প্রক্রিয়া আর কূট প্যাঁচ আবিষ্কার করেছিল। এই যেমন যুযুৎসু, কুংফু, আসন। কিন্তু আমার গুরু আমাকে ও লাইনে একদম যেতে বারণ করেছেন। আসলে হল কী জানো ?"

"কী পঞ্চানন্দদা ?"

"যার সঙ্গেই লড়তে যাই তারই ঘাড় ভাঙে কি হাত ভাঙে কি ঠ্যাং ভাঙে ! যত মোলায়েম করেই ধরি না কেন, একটা কিছু অঘটন ঘটেই যায় ! সেবার তো গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের হাতিটা খেপে বেরিয়ে পড়ল। বিস্তর লোক জখম হল তার পায়ের তলায় আর শুঁড়ের আছাড়ে। অগত্যা আমি গিয়ে হাতিটাকে সাপটে ধরলুম। ও বাবা, মড়াত করে দুটো পাঁজর ভেঙে হাতিটা নেতিয়ে পড়ল। তারপরই গুরু বারণ করলেন, ওরে তোর শরীরে যে স্বয়ং শক্তি ভর করে আছেন। আর কখনও কুস্তিটুস্তি করতে যাস না।"

ছেলেগুলো মুখ-তাকাতাকি করতে লাগল। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। না করলেও পঞ্চানন্দের ক্ষতি নেই। ছেলেগুলোকে অন্যমনস্ক রাখাটাই তার উদ্দেশ্য। হলঘরের ভিতর থেকে যে যান্ত্রিক শব্দটা আসছে সেটা ওদের কানে না যাওয়াই ভাল। পঞ্চানন্দকে একাই ব্যাপারটা দেখতে হবে।

ষণ্ডাটা বলল, "এক-আধটা প্যাঁচও কি শেখাবেন না দাদা ?"

পঞ্চানন্দ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "উপায় নেই রে ভাই। তবে এই বাড়িটা কিনে যদি সাধনপীঠ বানাতে পারি তখন দেখা যাবে।"

এ-কথায় ছেলেগুলো ফের মুখ-তাকাতাকি করল। কেঁদো চেহারার ছেলেটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, "দাদা, একটা কথা বলব ? আপনি যদি ডাইরেক্টলি আমাদের না শেখান তা হলেও ক্ষতি নেই। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কুস্তি করব, আর আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে তা আপনি দেখে-দেখে বলে দেবেন, তা হলে কেমন হয় ?"

সব ছেলেই এ-কথায় সায় দিয়ে উঠল।

গজ মাথা চুলকে বলল, "সেটা মন্দ হবে না। তা তাই হোক।"

বাড়ির পিছন দিকটায় মাটি কুপিয়ে কুস্তির আখড়া হয়েছে। ছেলেরা সেখানে একটা গাছতলায় পঞ্চানন্দকে বেশ খাতির করে বসিয়ে নিজেরা দঙ্গলে নামল।

পঞ্চানন্দ খুব মাথা নাড়তে লাগল কুস্তি দেখে। এক-একবার বলে ওঠে, "উহুঁহুঁ, হল না। পা-টা আর একটু কেতরে নিয়ে বল্টান মারতে হয়···· আরে আরে, ওরকম পটকান দিতে হলে যে শিরদাঁড়া শক্ত রাখতে হয়···· আহা-হা, ওরকম ঠেলাঠেলি করলে চলে ? পট করে কাঁধ ছেড়ে কোমরটা ধরে নাও এইবেলা····ওটা কী হল হে ? ছ্যা. ছ্যা, গজটা যে একেবারে কিছুই শেখায়নি তোমাদের !"

ঘণ্টা দেড়েক এরকম চালিয়ে পঞ্চানন্দ ছুটি পেল।

ঝিমঝিম করছে দুপুর। পঞ্চানন্দ পা টিপে-টিপে বাড়িতে ঢুকে আবার সেই হলঘরটার দিকে এগোল।

হঠাৎই সাক্ষাৎ এক ডাইনিবুড়ি কোত্থেকে যে বকবক করতে-করতে এসে উদয় হল, তা বলা শক্ত। তবে পঞ্চানন্দ একটা থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে পরিষ্কার শুনতে পেল বুড়িটা আপনমনে গজগজ করছে, "রোজ আমি হিরুকে এইখানে ঘাস খেতে বেঁধে রেখে যাই, লক্ষ্মী ছাগল আমার কোনওদিন পালায় না। আজ কোন অলপ্পেয়ে যে বাছাকে আমার গেরাস করতে এল গো !"

বলতে-বলতে বুড়ি হাঁটপাঁট করে চারদিকে ঘুরছিল। শনের মতো সাদা চুল, শরীরের চামড়ায় শতেক আঁকিবুকি, মুখখানা শুকনো, চোখ গর্তে, হাতে একখানা গাঁটওলা লাঠি।

পঞ্চানন্দ একটু গলাখাঁকারি দিল।

"কে রে ? কোন মুখপোড়া ? হিরিকে কি তুই গেরাস করেছিস রে ড্যাকরা ? আয়, সামনে আয় তো !"

পঞ্চানন্দ একবার বলবার চেষ্টা করল, "আমি নয় গো, আমি নয়।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা ! বুড়ি একেবারে লাঠি উঁচিয়ে ধেয়ে আসতে-আসতে বলল, "তুই না তো কে রে মুখপোড়া ? তোর মুখ দেখলেই তো বোঝা যায় গোরু-ছাগল চুরি করে-করে হাত পাকিয়ে ফেলেছিস । তোর চোখ দেখলেই তো বোঝা যায় তুই এক নম্বরের পাজি । তোকে আজ ঝেঁটিয়ে বিষ নামাব···"

পঞ্চানন্দ পিছু ফিরে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল । এ-কাজটা সে খুব ভাল পারে ।

দৌড়ে একেবারে হরিবাবুদের বাড়ির কাঁঠালতলায় এসে পঞ্চানন্দ হাঁফ ছাড়ল, "খুব বাঁচা গেছে বাপ্ । ওঃ, বুড়িটা কী তাড়াই না করেছিল !"

জামা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে পঞ্চানন্দ ধীরেসুস্থে বাড়িতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ ক্যাঁক করে কে যেন তার গর্দানটা বাগিয়ে ধরল খিড়কির দরজার কপাটের আড়াল থেকে ।

"দাদা, এই লোকটাই ।"

পঞ্চানন্দ সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আমি না । কালীর দিব্যি, আমি কিছু করিনি ।"

আংটি বলল, "তুমি নয় তো কে চাঁদু ? কাল মাঝরাতে দাদুর ল্যাবরেটরির কাছে ঘুরঘুর করছিলে, দেখিনি বুঝি ?"

কপাটের আড়াল থেকে আর-একজনও বেরিয়ে এল, ঘড়ি । খুব ঠাণ্ডা চোখে পঞ্চানন্দকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, "খুব গুলগপ্পো ঝেড়ে আমার বাবাকে বশ করে ফেলেছ, কেমন ?"

পঞ্চানন্দ অমায়িক হেসে বলল, "আজ্ঞে, অনেক কথার মধ্যে এক-আধটা বেফাঁস মিথ্যে কথা বেরিয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু সে তেমন না ধরলেও চলে । হরিবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, আমি তাঁকে আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম কি না যে, লোক আমি তেমন সুবিধের নই ।"

"বটে ! তা হলে তো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির । বাবাকে একটা চাবি দিয়েছ শুনলাম, আর নাকি গুপ্তধনের সংকেত !"

জিব কেটে পঞ্চানন্দ মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে ওসব বুজরুকি কারবার আমার কাছে পাবেন না । গুপ্তধনের কথা শিবুবাবু আমাকে বলতে বলেননি, আমিও বলিনি ।"

"তা হলে কথাটার মানে কী ?"

পঞ্চানন্দ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "সে কি আমিই জানি ? যেমন শুনেছি তেমনি বলেছি । তা ঘাড়খানা এবার ছেড়ে দিলে হয় না ? বড্ড টনটন করছে । আমার আবার একখানা বই দু'খানা ঘাড় নেই ।"

আংটি একটু হেসে একখানা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড়টা ছেড়ে বলল, "একটা কথা শুনে রাখো । আমার বাবা বেজায় ভাল মানুষ । তাঁকে যদি বোকা বানানোর চেষ্টা করো, তা হলে মাটিতে পুঁতে ফেলব ওই কেয়াঝোপের তলায় ।"

পঞ্চানন্দ উদাস মুখে বলল, "তিনটে লাশ ছিল, চারটে হবে ।"

"তার মানে ?"

"আজ্ঞে সে এক বৃত্তান্ত । কিন্তু আপনাদের যা ভাবগতিক দেখছি, বেশি বলতে ভরসা হয় না । হয়তো দিলেন কষিয়ে একখানা ঘুসো !"

ঘড়ি গম্ভীরভাবে বলল, "গুলগপ্পো যারা মারে তাদের মাঝে-মাঝে ঘুসো খেতেই হয় । এবার বলো তো চাঁদু, মাঝরাত্তিরে দাদুর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকেছিলে কেন ?"

"আজ্ঞে ওই গজটার জন্য । কতবার পই-পই করে বলেছি, ওরে গজ, মানুষ হ । পরের বাড়িতে ঢুকে ওসব করা কি ঠিক ? তা ভাল কথায় কবেই বা কান দিয়েছে ?"

"গজ মানে কি গজ-পালোয়ান ? সে কেন আমাদের বাড়িতে ঢুকবে ?"

"সেইটেই তো কথা । পেত্যয় না হয় ন্যাড়াবাবুর কাছ থেকেই শুনে নেবেন'খন ।"

ঘড়ি ঠাণ্ডা চোখে আবার একবার তাকে জরিপ করে নিয়ে বলল, "তোমার স্যাঙাতরা কারা ছিল ?"

"স্যাঙাত ! আজ্ঞে কোনওকালেই আমার স্যাঙাত-ট্যাঙাত নেই । বরাবর একাবোকা ঘুরে বেড়াই ।"

"তবে কেয়াঝোপের আড়াল থেকে তিনটে লোক যে বেরিয়ে এল, তারা কি ভূত ?"

পঞ্চানন্দ তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ও কথা বলবেন না । এখনও বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে । একেবারে জলজ্যান্ত তেনারা । আমার হাত দুয়েকের ভিতর দিয়েই হেঁটে গেলেন । গায়ে সেই বেটিকা গন্ধ, উলটো দিকে পা, হাওয়ায় ভর দেওয়া শরীর····ওরে বাবা ! ভাবতেও ভয় করে ।"

ঘড়ি ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিতভাবে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা ভূতটুত মানি না । ওসব বুজরুকি আমাদের দেখিও না । দাদুর ল্যাবরেটরির দিকে অনেকের নজর আছে, আমরা জানি । কিন্তু আমরাও বোকা নই, বুঝলে ? ওই তিনটে লোক তোমারই দলের ।"

পঞ্চানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "আজ্ঞে ভূত যদি নাও হয়, তা হলেও আমার সঙ্গে তাদের কোনও সাঁট নেই । তবে ওইখানে তিনটে লাশ বহুকাল আগে আমি আর শিবুবাবু মিলে পুঁতেছিলুম । তিনটেই সাহেব । গায়ে-গতরে পেল্লায় । বিশ্বাস না হলে জরিবাবু বা হরিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ।"

ঘড়ি বলল, "লাশ এল কোথা থেকে ?"

পঞ্চানন্দ দু'পা পিছু হটে বলল, "আজ্ঞে রদ্দা-ফদ্দা চালিয়ে বসবেন না যেন । এই সময়টায় আমার বড় খিদে পায় । আর খিদের মুখে মারধোর আমার সয় না ।"

"ঠিক আছে, মারব না । বলো ।"

"আজ্ঞে শিবুবাবু নিজের জান বাঁচাতে ওই তিন সাহেবকে খুন করেন । তারপর আমরা ধরাধরি করে····"

"মিথ্যে কথা !"

"আজ্ঞে খুনটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি । তবে কিনা নিজের জান বাঁচাতে খুন করলে সেটা খুনের মধ্যে ধরা যায় না ।"

"জান বাঁচাতে কেন ? ওরা কি দাদুকে মারতে চেয়েছিল ?"

পঞ্চানন্দ বলল, "সে কে আর না চাইত বলুন । শিবুবাবু মরলে অনেকেরই সুবিধে ছিল ।"

"খোলসা করে বলো ।"

পঞ্চানন্দ বলল, "বলব'খন । আগে চানটান করে দুটো মুখে দিয়ে নিই, পিত্তি পড়লে আবার অনর্থ হবে'খন ।"

কী ভেবে যেন ঘড়ি আর আংটি এ-প্রস্তাবে আপত্তি করল না । বলল, "ঠিক আছে ।" (ক্রমশ)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

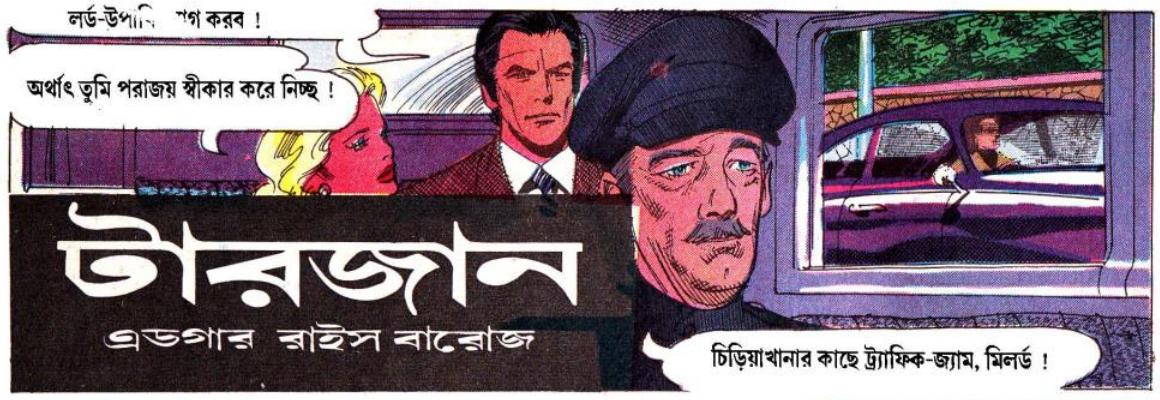

চিড়িয়াখানার একটা সিংহ খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে ! রাস্তায় তাহ ট্র্যাফিক-জ্যাম···

টারজান দেখলেন, অবস্থা ভয়াবহ···

পিছন থেকে সিংহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন টারজান । তার খানিক বাদেই···

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দোতলার ঘরে মনে হচ্ছে চোর ঢুকেছে

ক্যামেরা

জীবন ভৌমিক

মাঝরাতে ধুপ করে একটা আওয়াজে সুজয়ের দাদুর ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজটা দোতলার ঘর থেকে এল। কিংবা হয়তো দোতলার ঝুল-বারান্দা থেকে। কেউ যেন সেখানে লাফিয়ে পড়ল।

দাদুর পাশে সুজয় ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে চোখ মেলে দাদু কান পেতে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন।

সুজয়দের বাড়িতে কিছুদিন আগে একটা বড় অনুষ্ঠান হয়ে গেল। খুব জাঁকজমক করে সুজয়ের পৈতে দেওয়া হয়েছে। দুদিন আগেও বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল। আজ বাড়ি একদম ফাঁকা। এমনকী সুজয়ের মা-বাবাও নেই। ওঁরা একদিনের জন্য পানিহাটিতে সুজয়ের মাসির নতুন বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। সুজয় যায়নি। সে এখনও পৈতেতে পাওয়া তার উপহার-সামগ্রী নিয়ে ব্যস্ত। কত বই, কলম, জামাপ্যান্টের কাপড়, ক্যাসেট, ট্রানজিস্টার আর একটা দামি ক্যামেরা। সঙ্গে আছে ফ্ল্যাশ-বাল্‌বের ব্যবস্থা। অন্ধকারেও ছবি তোলা যায়। ক্যামেরাটা সুজয়কে ওর মামা দিয়েছেন। একটা সাধারণ বক্স-ক্যামেরা সুজয়ের আছে। তাই দিয়ে ছবি তোলাতে সুজয়ের হাত বেশ পেকেছে। পাকা ফোটোগ্রাফারের মতো সুজয় ছবি তোলে। ওর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল একটা ভাল ক্যামেরার। সে-সাধ তার পূর্ণ হয়েছে।

সুজয়ের দাদু শুনতে পেলেন, ওপর থেকে খুটখাট আওয়াজ আসছে। দোতলার ঘরে সুজয়ের মা-বাবা থাকেন। আজ সে-ঘরে তালা দেওয়া। তবে কি ছাদের পাইপ বেয়ে ঘরে চোর ঢুকল! দাদু ঘরের আলো না জ্বেলে আস্তে-আস্তে উঠে টেবিল থেকে টর্চলাইটটা হাতে নিলেন। তারপর খুব নিচু গলায় সুজয়কে ডেকে তুললেন

ঘুমজড়ানো চোখে সুজয় বলল, "কী হয়েছে?"

দাদু ফিসফিস করে বললেন, "দোতলার ঘরে মনে হচ্ছে চোর ঢুকেছে।"

সুজয় খুব সাহসী ছেলে। মুখে কোনও আওয়াজ না করে সে আলমারি থেকে কী যেন নিল। অন্ধকারে দাদু সেটা দেখতে পেলেন না। সুজয়ের বাবার একটা পিস্তল আছে। দাদু কিছুটা শঙ্কিত হয়ে বললেন, "তুমি কি পিস্তলটা নিলে নাকি দাদুভাই?"

সুজয় বলল, "পিস্তল নিইনি, আমি নতুন ফ্ল্যাশ-ক্যামেরাটা নিলাম।"

দাদু বললেন, "তুই কি চোরের ছবি তুলবি নাকি?"

এই সময় ওপর থেকে আবার একটা শব্দ হল। এবং দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দুটো বাজল। সুজয় বলল, "চলো দাদু, আর দেরি নয়, আস্তে-আস্তে ওপরে যাই। চোর ধরতেই হবে।"

দাদুর সঙ্গে সুজয় পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের

বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ডান দিকে সরু বারান্দার একপাশে একটা ঘর। অন্ধকারেও বোঝা গেল, ঘরের দরজা খোলা। তালা ভেঙে কেউ ভেতরে ঢুকেছে। দরজার উলটো দিকে একটা জানলা। জানলাটা খোলাই ছিল।

সুজয়ের দাদু কানে-কানে বললেন, "চোর-ডাকাতদের হাতে অস্ত্র থাকে। টের পেলে মেরে দিয়ে পালাবে। তার চেয়ে আয় দু'জনে মিলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক ডাকি।"

সুজয় কিছু না-বলে দাদুকে হাত ধরে টানতে-টানতে দরজার উলটো দিকের জানলাটার কাছে নিয়ে এল। ঘরের মধ্যে ফিকে আলো। ওরা দেখতে পেল, একজন ষণ্ডামার্কা লোক খুব তাড়াতাড়ি একটা থলেতে তাদের ঘরের দামি জিনিসপত্রগুলো ভরছে। চোরটা তখন জানলার দিকে মুখ করে স্টিলের আলমারির তালা ভাঙছে। জানলার বাইরে থেকে সুজয় তার ফ্ল্যাশ-ক্যামেরাটা চোরের দিকে তাক করে ক্লিক করে বোতাম টিপল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের মতো একঝলক আলো। চোরটা ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই সুজয় আবার ক্যামেরার বোতাম টিপল। আবার এক ঝলক আলো। হতভম্ব হয়ে চোরটা কোনওরকমে থলেটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকে নেমে যাওয়া পাইপ বেয়ে যখন সে নীচে নেমে যাচ্ছে, তখন সুজয় 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। দাদুও চেঁচাতে লাগলেন। কিন্তু পাড়ার লোক বেরিয়ে আসতে-না-আসতে অলিগলি দিয়ে চোর পালাল।

পরের দিন থানায় গিয়ে সুজয়ের দাদু ডায়েরি করে এলেন। থানার দারোগাবাবু দাদুকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের তালিকা দিতে বললেন। সবই করা হল। কিন্তু বামাল চোর ধরা পড়বে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ রয়ে গেল।

সেইদিন সন্ধেবেলায় সুজয় একটা ফোটো-স্টুডিও থেকে তার ফ্ল্যাশ-ক্যামেরায় তোলা ফোটো দুটো প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে দাদুর সঙ্গে থানায় এসে হাজির। দারোগাবাবুর টেবিলে চোরের ছবি রেখে সুজয় বলল, "এর পরেও কি চোর ধরতে আপনাদের অসুবিধে!"

ছবি দুটো দেখে দারোগাবাবুর চোখ কপালে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "তুমি এই ছবি কোথায় পেলে?"

সুজয় সেদিনকার রাতের ঘটনার কথা সবিস্তারে বলল। দারোগাবাবু শুনে বললেন, "তুমি কামাল করে দিয়েছ খোকা। বুদ্ধি করে যার ছবি তুমি তুলে নিয়েছ, সে সাধারণ চোর নয়, সে একজন ফেরারি আসামি। ওর একটা ছবি আমাদের দরকার ছিল। কথা দিচ্ছি, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওকে ধরে ফেলব এবং তোমাদের সব মালপত্র উদ্ধার করে দেব।"

ক্যামেরাটা সুজয়ের কাঁধেই ঝোলানো ছিল। সে দারোগাবাবুকে বলল, "অনেক ধন্যবাদ। কথা যখন দিলেন, তখন আসুন, আপনারও একটা ছবি তুলে রাখি।"

দারোগাবাবু কিছু বলার আগেই সুজয়ের ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

ছবি : প্রবীর সেন

এই সেদিনও

কার্তিক ঘোষ

এই যে শোনো, হ্যাঁ এদিকে, ভয় কি আছে বোকা ?
মা এখনও বাবার মতোই ডাকে আমায়, খোকা।
তোমার মতন এই সেদিনও ছোট্ট ছিলুম আমি···
পাখির পালক, কাচের ভ্যাঁটা, সব ছিল খুব দামি !
হিজলতলায় মেঘ-উড়ো দিন, ছায়ার কাছাকাছি,
খেলত কানামাছি।
ময়ূরকণ্ঠী আকাশ থেকে পরে রোদের টুপি,
দুপুরটা রোজ ডাকত এসে হঠাৎ চুপিচুপি···
তারপরে সেই পা টিপটিপ, ছুট পাঁইপাঁই মাঠে—
দেখতে দেখতে বিকেল নামত কখন খিড়কিঘাটে।
মাছরাঙা এক ঘুড়ি···
পাড়ায় কেন, গাঁয়ের কোথাও ছিল না তার জুড়ি।
তেমনি ছিল একটা আমার প্রজাপতির ডানা,
শিউলিতলার সকাল যেমন, সোনার ছবিখানা !
ছুটি বাজত ঢাকে···
কাশের বনে হঠাৎ-হঠাৎ দেখতে পেতুম তাকে।
দু'চোখে তার জরির সকাল, পায়ে নাচের নদী···
আহা, তখন একটা ছোট ক্যামেরা কেউ যদি
দিত আমায় খুব লুকিয়ে, ফোটো রাখতুম তুলে—
চশমাপরা এই বয়েসে, কে যেত রোজ ভুলে !
এই দ্যাখো না তুমি,
সেই ছড়াটা খুঁজতে খুঁজতে পাশের বাড়ির রুমি,
গলির মধ্যে কুড়িয়ে পেল আকাশটা একফালি,
জ্যোৎস্না কোথা, ধোঁয়ার গন্ধ, সেই নিয়ে হাততালি।
চাঁদ মরে ভূত, চরকা লোপাট, কয়লা কুড়োয় বুড়ি,
গড়ের মাঠে গোঁত্তা খেয়ে ল্যাজ কেটেছে ঘুড়ি।
ছোট্ট হতে ইচ্ছে করেও কেন যে হই বড়···
বলতে পারো, তুমি তো সব দরকারি বই পড়ো !

দেখতে খারাপ?

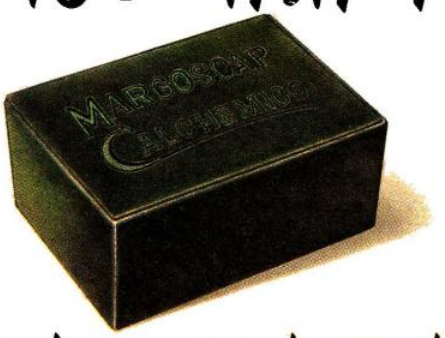

মাখতে ভালো!

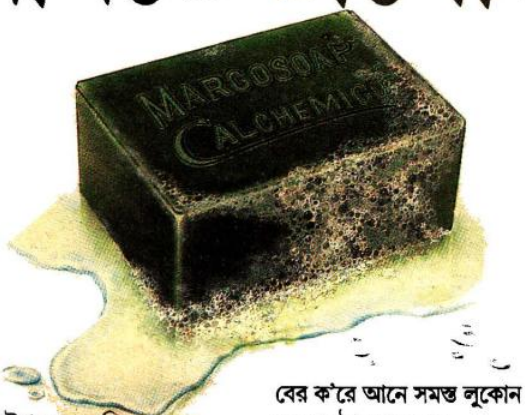

মহান নিম
পুরাণে বলে, একদা পৃথিবীতে উপছে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা অমৃত। জন্ম হ'ল নিমগাছের, তার শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ল মহৎ ওষধির গুণ।

আধুনিক গবেষণা বলে, নিমের শক্তি সবচেয়ে বেশি ক'রে আছে নিমের বীজ থেকে পাওয়া গাঢ়, ঘন নিমতেলের মধ্যে।

মার্গো ভারতবর্ষের আদি নিম সাবান। এর মধ্যে নিম তেলের পরিমাণ আর সব সাবানের চেয়ে অনেক বেশি। তাই, আজকের দূষিত আবহাওয়ার বিরুদ্ধে মার্গোর সযত্ন প্রহরা আপনার একান্ত প্রয়োজন।

শুদ্ধ মার্গো
মার্গোর প্রতিষেধক ক্ষমতা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে, বের ক'রে আনে সমস্ত লুকোন ধুলোময়লা ও বীজাণু। ত্বক হয়ে ওঠে সুস্থ সুন্দর।

সজীব মার্গো
মার্গোর যত্নে অত্যধিক তেলতেলে ভাব কেটে গিয়ে ত্বকে আসে এক ঝরঝরে সজীবতা।

উজ্জ্বল মার্গো
স্নানের সময় শরীরের প্রয়োজনীয় তেলটুকু ফিরিয়ে দেয় মার্গো—ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, ভ'রে ওঠে স্বাভাবিক লাবণ্যে।

মার্গোয় ঘন নরম ফেনার প্রাচুর্য। তবু খুব ধীরে ক্ষয় হয় মার্গো। তাই অনেক দিন অবধি মার্গো আপনার স্নিগ্ধ সজীব স্নানের সঙ্গী

60 YEARS IN SKIN CARE
60
NOW SOLD IN USA

মার্গোর গাঢ় নিমতেলের প্রাচুর্যে আপনার সারা দেহ হোক উদ্ভাসিত।

Response

সম্পূর্ণ উপন্যাস

হরে রাম

তারাপদ রায়

আশ্চর্য ফল

বয়েস হয়েছে হরগোবিন্দবাবুর। তা প্রায় একাত্তর, বাহাত্তর হবে। দক্ষিণ কলকাতায় হরিশ মুখার্জি রোডের পাশে একটা ছোট গলিতে পৈতৃক বাড়ি, দোতলায় থাকেন। নীচের তলায় দু-চারঘর ভাড়াটে আছে, একটা দোকনঘর ; ভালভাবেই সংসার চলে যায় তাঁর। তিন মেয়ে ছিল, যথাসময়ে তাদের বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে স্ত্রী সত্যভামা আর পুরনো কাজের লোক হাবুলের মা। অনেকদিন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করেছিলেন, এখন আর করেন না। একতলার চেম্বার দোকানঘর হিসেবে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। তবে সেই ডাক্তারির সুবাদে এখনও বহু লোক তাঁকে হরডাক্তার বা ডাক্তারবাবু বলে ডাকে।

সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন হরগোবিন্দবাবু ; খুব সকালে, এক-একদিন রাত থাকতেই ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আর বিছানায় শুয়ে থাকেন না তিনি। বেড়াতে অর্থাৎ মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়েন।

সত্যভামা একটু গজগজ করেন। বুড়ি হাবুলের মাকে তাঁর সঙ্গে নেমে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করতে হয়, সেও একটু গজগজ করে। হরগোবিন্দবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে একটা লাঠি হাতে নিয়ে হনহন করে ময়দানের দিকে চলে যান।

আগে কদাচিৎ ময়দানে আসতেন হরগোবিন্দবাবু। পাড়ার মধ্যেই ফুটপাথে সকালবেলায় একটু হাঁটাহাঁটি করে নিতেন। কিন্তু এখন কিছুদিন হল ময়দানের নেশা চেপে বসেছে তাঁর। জলবৃষ্টি হলেও বাদ নেই, ছাতা মাথায় দিয়ে আসেন, না হলে লাঠি হাতে সকালে ঘন্টাদেড়েক ময়দানে বেড়ানো তাঁর অবশ্যই চাই।

এই ময়দানেই একদিন বিপত্তিটা ঘটল। হরগোবিন্দবাবু ময়দানে ভ্রমণকালে দেখেছেন এই সাত-সকালে তাঁর বয়েসী বুড়োরা পর্যন্ত নানারকম উলটোপালটা জিনিস কিনে খায়। হজমি নুন দিয়ে লেবু-জল, কলে পেষানো আখের রস, এমনকী ঝালমুড়ি পর্যন্ত খায়।

হরগোবিন্দ একে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করেছেন, তাছাড়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। তিনি বুড়োদের এসব

হাবিজাবি রাস্তাঘাটে খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু সেই তিনিই একদিন লোভে পড়ে গেলেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরের গেটের ঠিক বাঁ পাশে কয়েকদিন হল একটা লোক কালোজাম নিয়ে বসেছে। এত বড়-বড় কালো ঝকঝকে জাম সচরাচর চোখে পড়ে না। একদিন সকালে হঠাৎ লোকটার কাছ থেকে জাম কিনে বসলেন হরগোবিন্দবাবু। মনে মনে ভেবেছিলেন, বাড়িতে নিয়ে যাবেন কিন্তু তখনই তাঁর খেয়াল হল সকালবেলা একঠোঙা জাম নিয়ে বাসায় গেলে সত্যভামা চেঁচামেচি করবেন, হাবুলের মা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে। এই জাম ফলটা সত্যভামার দু'চোখের বিষ। ওদিকে আজ কয়েকদিন হল সত্যভামা বাজার থেকে একটা কাঁঠাল আনতে বলেছিলেন, সেটা তাঁর খেয়াল করে আর নিয়ে আসা হয়নি।

সুতরাং কোর্টের দিকে যেতে-যেতে ঠোঙা থেকে একটা একটা করে জাম মুখে ফেলে ঠোঙাটা শূন্য করে ফেললেন হরগোবিন্দ। এর মধ্যে একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল। রাস্তায় পাশের কী একটা গাছ থেকে ভালমতন একটা ফল হাতের জামের ঠোঙাটায় হঠাৎ এসে পড়ে। তখনও পাঁচ-সাতটা জাম ঠোঙার মধ্যে ছিল, হরগোবিন্দবাবু ঠোঙা থেকে বাইরের ফলটা ফেলে দেবার জন্য খুঁজলেন কিন্তু সেটাও বোধহয় জামের মতো দেখতে, ঠিক ধরতে পারলেন না। ভাবলেন এ-দিকটায় দু-একটা জামগাছও আছে, তারই থেকে একটা হয়তো ঠোঙায় পড়েছে।

কিন্তু একটা ফল মুখে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চিবোতে গিয়ে তাঁর মনে হল আরে এটা তো জাম নয় কেমন একটা অদ্ভুত স্বাদ, তেতো-তেতো অথচ মিষ্টি-মিষ্টি আবার একটু টক ভাবও আছে, একটু ঝালও লাগছে। তাড়াতাড়ি চিবনো বন্ধ করে মুখ থেকে ফলটা থুঃ থুঃ করে ফেলে দিলেন তিনি। কিন্তু তখন একটু তো খাওয়া হয়ে গেছে।

এর পরেই শুরু হল চমকপ্রদ ব্যাপার। সহসা হরগোবিন্দবাবু খেয়াল করলেন, তাঁর কেমন যেন হালকা-হালকা লাগছে। তিনি রাস্তা থেকে নেমে ডানদিকে ময়দানের মধ্যে ঢুকে গেলেন, সেখানে তখন দলে-দলে ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

একটা মাঠের ফুটবল-সীমানা পেরিয়ে ঘাসের উপরে গড়াতে গড়াতে তাঁর পায়ের কাছে চলে এল, অন্য দিন এমন হলে তিনি বলটাকে এড়িয়ে যান। কিন্তু ছুটে গিয়ে আজ একটা কিক্ করলেন বলটায়, তারপর নিজের মনেই বললেন,

চপল ফুটবল করিছে খলবল।
চরণ-শতদল এখনও সম্বল ॥

বলেই হরগোবিন্দবাবুর কেমন খটকা লাগল, তিনি প্রাক্তন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ভবানীপুরের ছাপোষা মানুষ, হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে এ কী কথা বার হল ?

কিন্তু এত চিন্তা করার তখন আর তাঁর ফুরসত নেই। চরণ কথাটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে ; এদিকে যে বলটা মাঠের বাইরে থেকে কিক করে তিনি মাঠের মধ্যে ফেরত পাঠিয়েছিলেন সেটা একসঙ্গে পরপর তিনটে মাঠের তিনটে গোল ভেদ করে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল ; তিনি আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

শুধু লাফালেন তাই নয় লাফ থামানো মাত্র তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটি পদ্য ; সবচেয়ে আনন্দের কথা এর মধ্যেও চরণ শব্দটি আছে এবং তিনবার তিনটি গোলের উল্লেখ আছে।

চরণে চরণে হিন্দোল শুধু হিন্দোল,
দাও গোল—দাও গোল—দাও গোল।

তবে এবারের এই ছড়াটা কেমন যেন খটোমটো হয়ে গেল, গোল দিতে গিয়ে কোথায় যেন গোল বেধেছে ; কিন্তু সে সব উপেক্ষা করে তিনি দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হলেন, মুখে অনর্গল স্বরচিত পদ্য।

ময়দান পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে হরগোবিন্দ দেখলেন, একটা দোতলা বাস আসছে। অন্যদিনে হেঁটেই যান, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে বাসটায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তিনি যে যা-তা লোক নন, একজন স্বভাবকবি হয়ে গেছেন বাড়ি গিয়ে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সত্যভামা এবং সেই সঙ্গে হাবুলের মাকে বোঝাতে হবে।

পদ্যভরা প্রাণে, ঝলমল খুশিতে বাসে উঠেই হরগোবিন্দ কন্ডাক্টরের সামনে গিয়ে তাঁকে হাত নেড়ে বললেন :

(ওগো) কন্ডাক্টর, তুমি বা কে কার ?
(ওগো) হরডাক্তার, আমি বা কে কার ?
(ওগো) ভোরবেলাকার ডবল ডেকার ?
(ওগো) আমরা কে কার, তোমরা কে কার ?

এমন আমুদে বুড়ো বহুদিন কন্ডাক্টর ভদ্রলোক দেখেননি, তবে এ-সবের মাথামুণ্ডু কোনও মানে ধরতে না পেরে তিনি ফ্যালফ্যাল করে হরগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ-সবের মানে হরগোবিন্দবাবুর কাছেও স্পষ্ট নয়, তিনি বাস থেকে সুড়ুত করে নেমে গেলেন। অবশ্য তাতে তাঁর সুবিধেই হল, উলটো দিকে অল্প গেলেই তাঁর বাড়ি।

বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন হরগোবিন্দবাবু, দেখলেন ময়দান থেকে হেঁটে আসতে হয়নি বলে আজ প্রায় আধ ঘন্টা আগে বাড়ি ফিরেছেন।

খুশি মনে শিস দিতে গিয়ে হরগোবিন্দবাবুর মনে হল ফচকে ছেলের মতো এ-বয়েসে পাড়ার রাস্তায় শিস দেওয়া মানায় না, বরং মনে মনে তিনি নতুন এক পদ্যের প্রথম দু'কলি আওড়াতে লাগলেন, পদ্যটা এখনই মাথায় এল,

হরবাবু ভাল ভারী
ফেরে বাড়ি তাড়াতাড়ি ॥

পতন ও মূর্ছা

হরগোবিন্দবাবু সকালবেলা ময়দান থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসে একবাটি মুড়ি আর এক কাপ চা খান, আর সেই সঙ্গে খবরের কাগজটা পড়েন।

কিন্তু আজ তিনি আধঘন্টা আগে বাসায় ফিরেছেন। সিঁড়ির উপরে খবরের কাগজটা এখনও হকার ফেলে দিয়ে যায়নি আর চায়ের আয়োজন হতেও দেরি।

হরগোবিন্দবাবুর আর তর সইছে না, তাঁর মাথার মধ্যে পদ্য, ছড়া, কবিতা গিজগিজ করছে। তিনি তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে তাঁর বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে দেরাজ থেকে জমাখরচের খাতাটা বার করে পিছনের দিকের সাদা

পাতাগুলো ভরিয়ে ফেললেন যা মাথায় আসে তাই লিখে।

প্রায় আধঘন্টা ধরে পাতার পর পাতা লেখার পরে হরগোবিন্দবাবুর খেয়াল হল চশমা ছাড়াই তিনি এতখানি লিখে ফেলেছেন, তাই চোখটা টনটন করছে আর কী যে লিখেছেন সেটাও পড়া যাচ্ছে না।

এদিকে চায়ের পিপাসাও বেশ লেগেছে। অন্যদিন এ-সময়ে খবরের কাগজ পড়েন সেটাও তাঁর খেয়াল হল।

হরগোবিন্দবাবু কবিতা-লেখা থামিয়ে চা, খবরের কাগজ ইত্যাদির জন্যে রান্নাঘরের দিকে হাঁক দিলেন, কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে যেন কিছুতেই সোজা কথা বার হল না, বরং তাঁর স্ত্রী সত্যভামার উদ্দেশে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় তাঁর মুখ থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি ছড়া বেরিয়ে এল।

চায়ের কাপ মুড়ির বাটি
আনন্দবাজার পত্রিকাটি
সত্যভামা, সত্যভামা
নিয়ে এসো আমার চশমা।

সেই মুহূর্তে রান্নাঘরে চায়ের কেতলিতে দুধ মেশাচ্ছিলেন সত্যভামা। আজ পঞ্চাশ বছর তাঁর বিয়ে হয়েছে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে, কোনও দিন হরগোবিন্দবাবুকে তিনি একটা গানের কলি পর্যন্ত ভাঁজতে শোনেননি, হঠাৎ আজ এই সকালে স্বামীর মুখে এমন মধুর পদ্য শুনে সত্যভামা চমকে উঠলেন, দুধের কড়াটা হাত থেকে পড়ে সারা ঘরময় গরম দুধ ছলকে গেল। কিছুটা গরম দুধ ছিটকে তাঁর পায়ে পড়ে বেশ ছ্যাঁকাও লেগে গেল।

এই ধরনের ঘটনা বিপর্যয়ে সত্যভামা যখন বিমূঢ়, হরগোবিন্দবাবু তখন ভাবলেন সত্যভামা হয়তো কোনও কাজে আটকে গেছেন তাই সাড়া দিচ্ছেন না, অন্য সময় এমন হলে হাবুলের মা আসে, তাই এবার হাবুলের মার উদ্দেশে তিনি সেই আগের ছড়াটি আওড়ালেন। শুধু সামান্য পরিবর্তন, সত্যভামার জায়গায় হাবুলের মা,

চায়ের কাপ, দুধের বাটি
আনন্দবাজার পত্রিকাটি
হাবুলের মা, হাবুলের মা
নিয়ে এসো আমার চশমা।

হাবুলের মা একটু আগে সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছিল, তাই সে আগের পরের ছড়া শুনতে পায়নি কিন্তু রান্নাঘরে দুধের কড়ার পতনের শব্দে এখন সে বিপদগ্রস্তা সত্যভামার কাছে ছুটে এসেছে, একটা ভেজা গামছা দিয়ে সত্যভামার পায়ের গরম দুধ মুছে দিচ্ছে, এমন সময় ডাক্তারবাবুর এই আশ্চর্য পদ্য শুনে তার চোখ কপালে উঠল।

সর্বনাশ! ডাক্তারবাবু এরকম করছে কেন? তিরিশ বছর আগে চেতলাহাটে রামযাত্রায় হাবুলের মা এরকম ভাষায় কথা বলা শুনেছিল। তা ছাড়া সে আজ কম করেও পনেরো-বিশ বছর ডাক্তারবাবুর এখানে, তার চোখের সামনেই ডাক্তারবাবুর তিন মেয়ের পর পর বিয়ে হল, ডাক্তারবাবুর মুখে এরকম ভাষা সে কখনও শোনেনি।

হরগোবিন্দবাবুর কণ্ঠে দ্বিতীয় দফায় পদ্য শুনে এবং চির-অনুগতা হাবুলের মা'র হতচকিত ভাব দেখে এবার আর

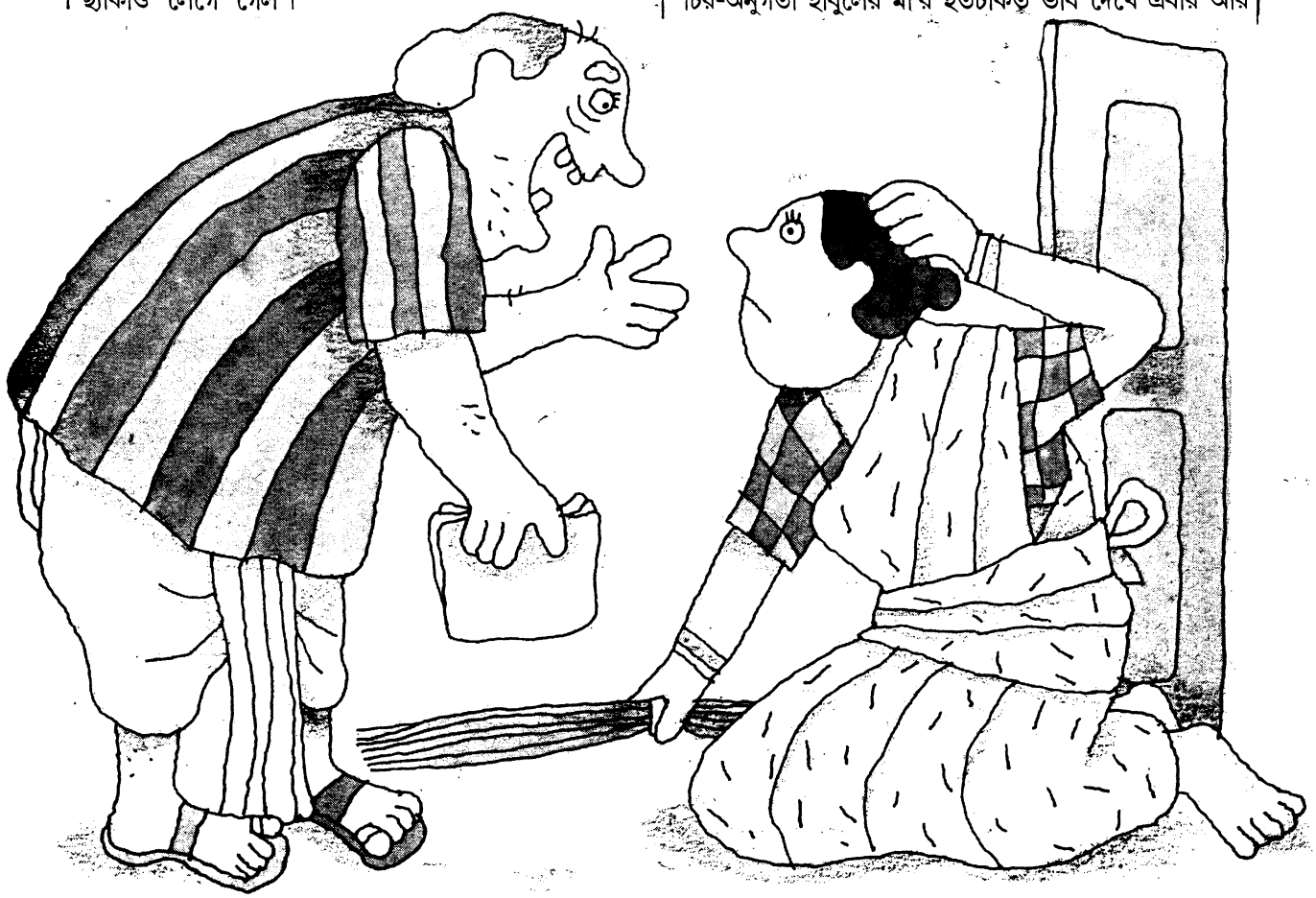

এবার আপনি কেয়ো-কার্পিন চুলে নতুন নতুন রূপে প্রতিদিন

টপনট বাঁধার দিন

বিনুনী বাঁধার দিন

খোঁপা করার দিন

পোনি টেলের দিন

চুল খুলে রাখার দিন

ফ্রেঞ্চ রোলের দিন

ইচ্ছে মতন বাঁধার দিন

আপনার চকচকে সুন্দর কেয়ো-কার্পিন চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না। চুল থাকে সুন্দর, পরিপাটি।

আধুনিক সাজে সাজতে হলে তাই আর তেলমাখা বন্ধ করতে হবে না। রোজ কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল মাখুন—চুল থাকবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধী। আর সপ্তাহের প্রতিদিন নতুন ধাঁচে চুল বেঁধে নতুনরূপে নিজেকে আবিষ্কার করুন।

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

কেয়ো-কার্পিন
সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-7

সত্যভামা সামলাতে পারলেন না, ছুটে বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে হরগোবিন্দবাবুকে বললেন, "তুমি এরকম করছ কেন ? তোমার কী হয়েছে ? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ?"

সত্যভামা যে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেছেন সেদিকে কিন্তু হরগোবিন্দবাবুর খেয়াল নেই, তাঁর আবার কাজের আবেগ এসে গেছে। তিনি চশমাহীন চোখে বিনা বাধায় আবার তরতর করে পদ্য লিখে চলেছেন জমাখরচের খাতায়।

ইতিমধ্যে সত্যভামার পিছু-পিছু হাবুলের মা'ও ভাইদের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হরগোবিন্দবাবু অবিরাম লিখে যাচ্ছেন, আর যা লিখছেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন।

হরগোবিন্দবাবু শান্ত, গোবেচারা, ছাপোষা মানুষ, যিনি কোনওদিন কোনও গোলমালে নিজেকে জড়াননি, সামান্য চা ছাড়া যাঁর কোনওদিন কোনও নেশা নেই, যিনি এই সেদিন পর্যন্ত বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, যাঁকে আজও পরিচিত লোকজন ডাক্তারবাবু বলে শ্রদ্ধা করে—আজ তাঁর এ কি অবস্থা ? সত্যভামা আর হাবুলের মা দুজনেই কিছুক্ষণ থ মেরে হরগোবিন্দবাবুর কাব্যরচনা এবং তৎসহ অস্ফুট কাব্যপাঠজনিত আবেগবিহ্বল অবস্থা দেখলেন, একসঙ্গে দুজনের বুক ফেটে মর্মস্পর্শী আর্তনাদ বার হল, "হায় ! হায় ! এ কী সর্বনাশ হল।"

কাব্যচর্চায় যতখানিই আত্মনিমগ্ন থাকুন, দুই মহিলার এই মর্মান্তিক আর্তনাদে হরগোবিন্দবাবুর ঘোর একটু কাটল। তিনি মুখ তুলে তাকাতেই সত্যভামা ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে, "ওগো, তোমার কী হল, তুমি এমন হলে কেন ?"

বাইরের ঘরের তক্তপোশে বুকে একটা বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে এতক্ষণ যে-হরগোবিন্দবাবু কাব্যচর্চায় ব্যস্ত ছিলেন, দুই মহিলার আর্তনাদ এবং তদুপরি সত্যভামার আকুতি শুনে তিনি এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তক্তপোশের উপরে, তারপর গড়গড় করে বলে চললেন :

গিয়াছিনু ময়দানে ভিক্টোরিয়া হল।
তারই কাছাকাছি এক জ্ঞানবৃক্ষতল ॥
সেইখানে গুটি কয় মিঠা জামফল।
এবং অচেনা এক গোলগাল ফল ॥

এই পর্যন্ত বলে হরগোবিন্দ সহসা থেমে গেলেন, তারপর বললেন, "সত্যভামা, জামফল আর গোলগাল ফল, পরপর দু'বার ফল হল, তোমার কানে লাগছে না ?"

এই অসম্ভব প্রশ্ন শুনে সত্যভামা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, সেই সঙ্গে হাবুলের মা, সে-ও কিছু না বুঝে ডুকরে উঠল।

কিন্তু হরগোবিন্দবাবু অদমিত, তিনি সেই তক্তপোশের উপর দাঁড়িয়ে আবার বলা শুরু করলেন :

গিয়েছিনু ময়দানে জ্ঞানবৃক্ষতল।
সেইখানে খেয়েছিনু গোলগাল ফল ॥
তদবধি চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।
তদবধি হল মোর চরণ চঞ্চল ॥
তদবধি চিত্ত মোর গোল ফুটবল।...

এর পরেও বোধহয় আরও কিছু ছিল, কিন্তু ওই ফুটবলে এসে হরগোবিন্দবাবু সহসা এমন এক গগনভেদী লাফ মারলেন যে ছাদের সিলিং পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে মাথায় এক ঠোক্কর খেয়ে তিনি চিতপাত হয়ে পড়লেন তক্তপোশের উপরে, তখনও কিন্তু তাঁর পদ্যের আবেগ এই আঘাতের পরেও কোনও রকম প্রশমিত হল না, তাঁর কপালের উপরে মাথার নীচে যেখানে ধাক্কা লেগেছিল, সে জায়গাটা একটা বড় সুপুরির মতো ফুলে উঠল, তবু তক্তপোশে চিতপাত হয়ে পড়ে, কাতরাতে-কাতরাতে তিনি আওড়াতে লাগলেন,

তক্তপোশের সঙ্গে আপোস
হরগোবিন্দ করবে না,
ছাদের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে
হরগোবিন্দ মরবে না।

আর্নিকাকে কে মনে রাখে

হরগোবিন্দবাবুর এই তেজ কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। সেই অদ্ভুত ফল খাওয়ার জন্যেই হোক কিংবা মাথায় চোট খাওয়ার জন্যেই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কবিতার আবেগ বন্ধ হল, তিনি চোখ বুজে তক্তপোশের উপরে এলিয়ে পড়ে গেলেন।

স্বামীকে প্রথমে পদ্যে পাওয়ায় এবং তারপরে তাঁর লাফ দিয়ে আহত হয়ে মূর্ছা যাওয়ায়, বিশেষ করে এই সব অকল্পনীয় ঘটনার আকস্মিকতায় সত্যভামা দেবী বৈঠকখানা-ঘরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

ভয় ও কাঁপুনি ব্যাপারটা অত্যন্ত সংক্রামক, সত্যভামা দেবী যতটা কাঁপতে লাগলেন, তার দ্বিগুণ কাঁপতে লাগল হাবুলের মা। দু'জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কম্প প্রতিযোগিতা শুরু হল। পাশের বাড়ির দোতলা থেকে হঠাৎ এই দৃশ্য চোখে পড়ল ভবানীবাবুর স্ত্রীর।

ভবানীবাবু আলিপুর আদালতে ওকালতি করেন। ভবানীবাবুরা হরগোবিন্দবাবুদের বহুকালের প্রতিবেশী। ভবানীবাবুর স্ত্রী হেমলতা সত্যভামা দেবীকে পাড়াসুবাদে 'দিদি' বলেন। তিনি দিদির ও তাঁর পরিচারিকার অস্বাভাবিক কাঁপুনি দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন।

পাড়ায় অনেক বাড়িতে অনেক রকম উলটোপালটা অঘটন ঘটে। এই তো সেদিন গলির পাশের সামন্তদের বাড়ির বুড়ো হুলো বেড়াল খেপে গিয়ে বাড়ির প্রায় সমস্ত লোককে কামড়ে, আঁচড়ে হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিয়েছিল। আরেকদিন ও-দিকের একটা বাড়ির একটা ছোট ছেলে বাথরুমে ছিটকিনি দিয়ে আর খুলতে পারে না, শেষে পাড়ার লোকে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ছেলেটাকে বার করল।

কিন্তু হরগোবিন্দবাবুদের বাড়িতে চিরকালই সবকিছু ঠিকঠাক স্বাভাবিক মতো হয়। কোনওদিন কোনও গোলমাল, হৈচৈ হেমলতা ও-বাড়িতে দেখেননি। সুতরাং আজ তিনি হরগোবিন্দবাবুর বৈঠকখানা-ঘরের দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তবুও মন্দের ভাল যে, হেমলতা হরগোবিন্দবাবুর পদ্যপাঠ এবং লাফ দেখেননি।

সে যা হোক, তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে হেমলতা তাঁর ছোট ছেলে অনাদিকে পাঠালেন পাশের বাড়িতে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে।

বছর পনেরো বয়েস হবে অনাদির, মিত্র স্কুল থেকে এবার মাধ্যমিক দেবে। সে হরগোবিন্দবাবুকে জ্যাঠামশায় এবং সত্যভামা দেবীকে মাসিমা বলে।

দু-মিনিটের মধ্যে অনাদি ছুটে হরগোবিন্দবাবুর দোতলায় উঠে গেল। দোতলায় সিঁড়ির ডানপাশে রান্নাঘর, সেখানে দুধের পাত্র উলটে পড়ে আছে, ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়া দুধ একটা বুড়ো বেড়াল বসে চেটে চেটে খাচ্ছে।

বুড়ো বেড়ালটাকে দেখে অনাদি ভুল করে বসল। সে ভাবল কয়েকদিন আগে সামন্তদের বাড়িতে যা হয়েছে, আজ এ-বাড়িতেও তাই হল, বাড়ির সবাইকে নিশ্চয় বেড়ালে কামড়েছে। সে নিজেও ভয় পেয়ে বেড়ালের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে চলে এল।

ছেলের ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে হেমলতা যখন প্রশ্ন করলেন, "কী রে, কী হল ?" অনাদি তখনও হাঁফাচ্ছে। সে দম নিয়ে বলল, "বেড়াল," তারপর আবার দম নিল এবং বলল, "মাসিমাদের বেড়ালে কামড়েছে।"

কথাটা মুহূর্তের মধ্যে পাড়ায় রটে গেল। পাড়ার যেখানে যত সাহসী লোক ছিল সবাই দল বেঁধে, কেউ লাঠি নিয়ে, কেউ বঁটি, দা, কেউ কাটারি, কেউ কয়লাভাঙার হাতুড়ি এইসব নিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে হরগোবিন্দবাবুদের বাড়ির দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

এদিকে দুধের কড়া উলটে যে দুধটুকু রান্নাঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সবটুকু এবং সেইসঙ্গে দুধের কড়ার গায়ে যে ছিটেফোঁটা দুধ তখনও লেগে ছিল সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে বুড়ো বেড়ালটা তখন হাওয়া হয়ে গেছে। কোথাও সামান্য দুধের বা বেড়ালের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সকলের আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল অনাদি, সে হাতের কাছে লাঠিসোটা না পেয়ে তার বাবার টেবিল থেকে চামড়ায় বাঁধানো বড় ইংরেজি অভিধানটা নিয়ে এসেছিল তেমন বিপদ হলে বেড়ালটার গায়ে ছুঁড়ে মারবে বলে।

অনাদিই প্রথম অবাক হল, রান্নাঘরের দরজা সেই রকমই হাটখোলা, কিন্তু বেড়ালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অনাদির পিছে-পিছে সশস্ত্র জনতা তারাও বেড়াল খুঁজছে, কিন্তু কোথায় বেড়াল ?

বেড়ালের খোঁজে এর পরেই সবাই ঢুকল বৈঠকখানায়, সেখানে তখনও হতভম্ব সত্যভামা এবং হাবুলের মা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একসঙ্গে লাঠিসোটা নিয়ে পাড়ার সব লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দেখে, কিছু না বুঝে সত্যভামা 'আঁ-আঁ-আঁ' করে চেঁচিয়ে উঠলেন, কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে অধিকতর উচ্চনাদে হাবুলের মা 'আঁ-আঁ-আঁ' করে উঠল।

পাড়ার লোকেরা এ-রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেনি, তারা বেড়াল মারতে এসেছিল। তারা এই গুরুতর আর্তনাদের সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এদিকে এই পরপর দুটি প্রাণঘাতী চেঁচানিতে, সেই সঙ্গে এত লোকের হট্টগোলে সংবিৎ ফিরে এল হরগোবিন্দবাবুর, তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

একসঙ্গে এত লোক মারমুখী অবস্থায় নিজের ঘরের মধ্যে দেখলে এবং সেই সঙ্গে বাড়ির লোকের কাতর আর্তনাদ শুনলে যে-কোনও লোক আবার ভিরমি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত, কিন্তু ময়দানের সেই অজ্ঞাতপরিচয় ফল খেয়েই বোধহয় আজ তাঁর মনে রাগ নেই, ভয় নেই, শুধু আনন্দ আর পদ্য।

এখনও মাথাটা সিলিংয়ের ধাক্কার চোটটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বেশ ঝিমঝিম করছে, তবু হরগোবিন্দ হাসিমুখে বিছানা থেকে উঠে এলেন, তারপর হাত তুলে আশীর্বাদ দানের ভঙ্গিতে সত্যভামা আর হাবুলের মাকে আর চেঁচাতে মানা করলেন। দুই মহিলা একটু থামতে তিনি অপেক্ষমাণ, কৌতূহলী জনতার দিকে ধীরে ধীরে এগোলেন।

ইতিমধ্যে হরগোবিন্দবাবুর কপালের উপরের জায়গাটা এখন আর সুপুরির মতো নয়, প্রায় একটা ছোট বেলের আকার ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁর চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল। মুখে খ্যাপা হাসি, তাঁকে দেখে সমঝদার লোকদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

হরগোবিন্দবাবু যত হাসিমুখে গুটিগুটি এগোন, জনতা তত পিছোতে থাকে, জনতা প্রায় সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত পিছিয়েছে এমন সময় তিনি হঠাৎ দু'হাত সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন :

ওরে লাঠি, ওরে বঁটি, ওরে ও কাটারি।
তোদের চিবিয়ে আজ আমি খেতে পারি ॥
ওরে বঁটি, ও কাটারি, ওরে ওরে লাঠি।
একে একে চলে আয় ধরে ধরে কাটি ॥
ও কাটারি, ওরে লাঠি, ওরে ওরে বঁটি।
আয় দেখি চলে আয় তোরা সব ক'টি ॥

এই সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে গান শেষ হওয়ার ঢের আগে সমস্ত বীরপুরুষেরা, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, খেয়ে ফেললে রে," ইত্যাদি কাতরোক্তি সহকারে সিঁড়ি বেয়ে ধাক্কাধাক্কি করে দৌড়ে পালাল। কারও পায়ের চটি, কারও হাতের লাঠি, অনাদির হাতের ডিকশনারি এই সব সিঁড়ির উপর পড়ে রইল। যে যার মতো প্রাণ নিয়ে ছুটল।

হরগোবিন্দবাবু সিঁড়ির উপরে গিয়ে অনাদির ফেলে যাওয়া মোটা ইংরেজি অভিধানটা কুড়িয়ে নিলেন, তারপর বই খুলে পাতা ওলটাতে ওলটাতে ইংরেজি সুরে গান ধরলেন :

জাংশানে ফাংশানে আনশান,
ফিকশান টিকশান খানখান,
কোচোয়ান টোচোয়ান ধরে আন।

টোচোয়ানে এসে হরগোবিন্দবাবুর খটকা লাগল টোচোয়ান শব্দটা ইংরেজি কি না, ইংরেজি অভিধানের পাতা উলটিয়ে শব্দটা বার করতে গিয়ে গানের খেইটা হারিয়ে ফেললেন তিনি। বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে অভিধানটা আবার সিঁড়ির উপরে ছুড়ে দিলেন। তারপর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে তাকের উপরের থেকে অনেকদিন ফেলে-রাখা ধুলো-জমা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইটা হাতে তুলে নিলেন।

বইটা খুলে পাতা ওলটাতে-ওলটাতে প্রসন্ন আনন্দে মন ভরে গেল হরগোবিন্দবাবুর। হ্যাঁ, এই হল বই বটে, কী চমৎকার পদ্য হবে সব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল পদ্য বার হতে লাগল।

শুধুই গান শুধুই পূজা। শূন্য পেটে একটু থুজা ॥

ভরদুপুরে কাকের ডাকে। আর্নিকাকে কে মনে রাখে ॥
ব্রায়োনিয়ার ইয়ারগন। সন্ধ্যারাতে কী কথা কন ॥
যেমন কাজ তেমন লীলা। পালসেটিলা পালসেটিলা ॥

রাম-ডাক্তার

কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত পাড়ায় রটে গেল বেড়ালের কামড়ে হরগোবিন্দবাবুর বাড়ির সমস্ত লোক ধুম-পাগল হয়ে গেছে। কী করা যায়, কী করে এই সমূহ বিপদ থেকে হরগোবিন্দ-ডাক্তারের পরিবারকে রক্ষা করা যায়। তাই নিয়ে শুরু হল গলির মধ্যে ছোট-বড় জটলা।

কেউ বলছে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বিশেষজ্ঞ পশু-চিকিৎসককে নিয়ে আসা যাক, তিনি নিশ্চয় এর ওষুধ বলতে পারবেন, চিড়িয়াখানায় বাঘ-সিংহ-বাঁদর কত লোককে কামড়ায় তিনি নিশ্চয় সব জানেন, বেড়ালের কামড়ের প্রতিষেধক জানেন।

অন্যেরা বলছে, "দূর ছাই। হরগোবিন্দবাবুরা তো আর পশু নয়, পশু হল বেড়াল। বরং হাসপাতালে নিয়ে যাই, সেখানে দেখবে।" আর-একদল বলছে, "হাসপাতালে গেলে কচু হবে, হাজরার মোড়ে গিয়ে উন্মাদ আশ্রমের রামডাক্তারকে ডেকে আনো।"

এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা জানে না, রাম-ডাক্তারের সঙ্গে হরগোবিন্দ-ডাক্তার অর্থাৎ হর-ডাক্তারের সম্পর্ক কী রকম।

রাম-ডাক্তার আর হর-ডাক্তার পুরনো বন্ধু, অথবা বলা উচিত পুরনো শত্রু। সাউথ সুবার্বন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দু'জনের পরিচয়। হরগোবিন্দের সঙ্গে রামশঙ্করের অর্থাৎ রামের এক সময় এত গলায় গলায় ভাব ছিল যে একত্রে এদের দু'জনকে সংক্ষিপ্ত করে হরে-রাম বলা হত। তাঁদের এই যুগ্ম নামকরণ সত্যিই সার্থক হয়েছিল। সে সময়ে এই হরেরাম নামক দ্বন্দ্ব সমাসটিকে শুধু রাতে ঘুমনোর সময় আর দুপুরে খাওয়ার সময় ছাড়া আর কখনও আলাদাভাবে দেখতে পাওয়া যেত না।

দুজনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, দুজনেই সেকেণ্ড ডিভিশনে। সেকালের সেকেণ্ড ডিভিশন চাট্টিখানি কথা নয়। হরগোবিন্দবাবু কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু রামবাবুর বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, তাঁর কলেজে পড়া হল না।

ঠাকুরপুকুরের কাছে তখন এক পাগলাবাবা থাকতেন। বাবা নিজে পাগল ছিলেন না, কিন্তু বাবা ছিলেন পাগলের টোটকা চিকিৎসক, তাঁর চিকিৎসা-ব্যবস্থার নাম মুষ্টিযোগ।

মুষ্টিযোগ মানে মারধোর নয়, তবে কিছুটা মারধোরও প্রয়োজনে বোধহয় দরকার পড়ে পাগলের চিকিৎসায়। অব্যর্থ চিকিৎসা ছিল পাগলাবাবার। হাজার-হাজার পাগল তাঁর হাতে ভাল হয়েছিল। দুর্দান্ত, কুখ্যাত, ডাকসাইটে পাগলেরা পাগলাবাবার নামে থরথর করে কাঁপত।

কাঁপারই কথা। বিশাল দশাসই চেহারা। কপালে আধুলি সাইজের লাল টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা, সঙ্গে লাল রেশমের আলখাল্লা, কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল, ঘোলাটে চোখ, আর বাজখাঁই গলা—যা কিছু একজন মানুষকে ভয়াবহ করার জন্যে দরকার সবই ছিল পাগলাবাবার।

জীবিকার অন্বেষণে রামশঙ্কর সেই পাগলাবাবার চেলা হয়ে গেলেন। চার বছর পাগলাবাবার পা টিপে, রান্না করে,

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

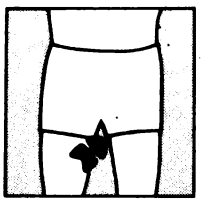

ধোবিজ ইচ্—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

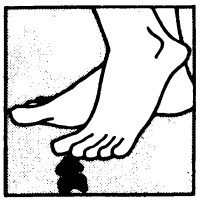

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

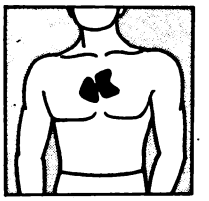

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে—যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

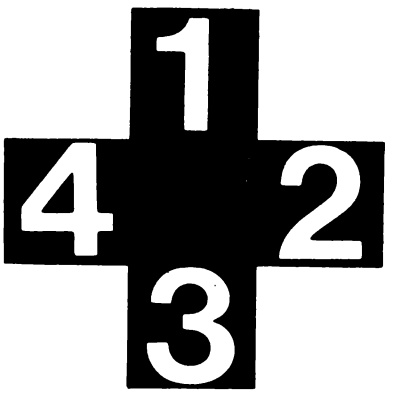

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ছত্রাকজনিক সংক্রমণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

PRAGMATAR®
Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid 28g.

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKEF — AN ESKAYEF PRODUCT
© Eskayef Limited

পাগলাবাবার উন্মাদ রোগীদের হাতে মারধোর খেয়ে বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে রামশঙ্কর মুষ্টিযোগ কিছুটা শিখলেন।

চেলাগিরি শেষ হল পাগলাবাবার মৃত্যুতে, তখন রামশঙ্কর এসে হাজরার বাড়িতে 'উন্মাদ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে বড় সাইনবোর্ডে লিখে দিলেন।

উন্মাদ আশ্রম

মুষ্টিযোগ প্রক্রিয়ায় যে-কোনও প্রকার পাগল নূতন, পুরাতন, নিরীহ, দুর্দান্ত সকল পাগল আরোগ্য হয়।

প্রথম প্রথম রোগী হয়নি। তখন হরগোবিন্দ খুব সাহায্য করেছিলেন রামশঙ্করকে, বছরে দুবার পালা করে পাগল সাজতেন, তারপর রামশঙ্কর তাঁকে ভাল করে তুলতেন। এই ভাবে রাম-ডাক্তারের নাম হতে লাগল।

এর মধ্যে পরপর দুবার বি· এ· ফেল করার পরে এবং রাম-ডাক্তারের প্র্যাকটিস লাগতে দেখে হরগোবিন্দও ডাকযোগে হামিওপ্যাথিক পাশ করে একটা ওষুধের বাক্স আর পারিবারিক হোমিও চিকিৎসা বই কিনে হর-ডাক্তার হয়ে বাড়ির নীচের বাইরের ঘরে চেম্বার খুলে বসলেন।

তখন দুজনের মধ্যে লাগল সংঘাত। একবার হর-ডাক্তারের এক রোগী পাগল হয়ে যেতে তাকে রাম-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পরে হর-ডাক্তার পরম্পর শুনতে পেলেন, রাম-ডাক্তার নাকি বলেছে হরের ওষুধ খেয়ে পাগল হয়েছে।

ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তেজিত হর-ডাক্তার চারদিকে রটাতে লাগলেন, রামটা তো রামবোকা। ও আবার ডাক্তার হল কবে ? বুজরুকি করে লোক ঠকায়, পাগলদের শোষণ করে।

অতঃপর যা হবার হল। দুই বন্ধুর মধ্যে কতাবার্তা, মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হল। সে-ও আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

একই পাড়ার দু'প্রান্তে দু'জন থাকেন। কখনও-সখনও বাজারে সভা-সমিতিতে বা বিয়েবাড়িতে দুজনের দেখা যে হয়নি তা নয়, তবে দুজনেই সঙ্গে-সঙ্গে দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তারপর তো হর-ডাক্তার ডাক্তারিও ছেড়ে দিলেন একদিন। আজকাল আর সকালবেলা বেড়াতে যাওয়া ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ বার হন না হরগোবিন্দ, রামের সঙ্গে আর দেখাও হয় না। পুরনো ভালবাসা যেমন আর ফিরে আসেনি, রেষারেষির ভাবটাও সময়ের সঙ্গে কবে ভেসে গেছে।

পাড়ার লোকেরা রাম-ডাক্তার আর হর-ডাক্তারের এসব আদ্যিকালের ব্যাপার কিছু জানে না। তারা অনেক চিন্তা-চরিত্র করে অবশেষে স্থির করল হর-ডাক্তারের বাড়ির সবাই যখন বেড়ালের কামড়েই হোক অথবা যে-কোনও কারণেই হোক পাগল হয়ে গেছে তাহলে, হাতের কাছে বিখ্যাত পাগলের ডাক্তার রামশঙ্কর থাকতে আর কাউকে প্রথমে ডাকার মানে হয় না।

সুতরাং অনতিবিলম্বে একদল প্রতিবেশী ছুটল হাজরার দিকে উন্মাদ আশ্রমে রাম-ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্যে। আর রাম-ডাক্তারও সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকেন নতুন-নতুন পাগলের জন্যে। সুতরাং কল পাওয়া মাত্র তিনি কোথায়, কী বৃত্তান্ত কিছু খবর না নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নতুন রোগীর উদ্দেশে।

পুনর্মিলন

যা হোক এবার আরেকবার আমরা হর-ডাক্তারের বাড়িতে ফিরে আসি। সব লোক তাড়িয়ে দিয়ে যখন অনাদির বাবার ইংরেজি অভিধান খুলে হরগোবিন্দ গান গাইতে গাইতে বইটা সিঁড়িটার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৈঠকখানা-ঘরে এসে ঢুকলেন এবং তারপর তাকের উপর থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইটা নামিয়ে পাতা খুললেন, তখন সত্যভামা দেবী ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম জপ করতে লাগলেন।

আসলে ইতিমধ্যে সত্যভামা কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়েছেন, হাবুলের মা'র কাঁদাকাটিও থেমেছে। তবে বাড়ির মধ্যে এত লোক কেন তাড়া করে উঠে এসেছিল সে বিষয়ে তাঁর এবং হাবুলের মা দুজনেরই বিশেষ সংশয় দেখা দিয়েছে।

সে যা হোক, স্বামী যখন ইংরেজি গান বন্ধ করে ইংরেজি অভিধান ছুঁড়ে ফেলে হোমিওপ্যাথিক বই বহুদিন পরে খুললেন, সত্যভামা দেবীর মনে একটু আশার সঞ্চার হল। হাজার হলেও ডাক্তার তো, বই খুলে এবার চিকিৎসার ওষুধ নিজেই বার করবে। কিন্তু সে জায়গায় যেই হরগোবিন্দবাবু 'পালসেটিলা-পালসেটিলা' বলে গান গেয়ে উঠলেন, সত্যভামা পুনরায় মুষড়ে পড়লেন।

স্ত্রী কিংবা পরিচারিকার বিহ্বলভাব লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা এখন হরগোবিন্দের নেই। তিনি তাঁর ডাক্তারির বই আবার তাকে তুলে রেখে তক্তপোশে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে জমাখরচের খাতা খুলে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে লিখতে লাগলেন,

বালিশ চাইছে পালিশ
বালিশ চাইছে মালিশ
বালিশ বালিশ বালিশ
বালিশ কেন যে পালিস ?

এ পর্যন্ত লিখে তিনি বিছানায় উঠে বসে বালিশটাকে ছুঁড়ে মারলেন হাবুলের মা'র দিকে, আসলে এখন তাঁর খুব খিদে লেগেছে। সাতসকালে কয়েকটা জাম আর সেই ফলটা অল্প খেয়েছিলেন, চা-মুড়ি আজ কিছু খাওয়া হয়নি, পেট চুঁই-চুঁই করছে, তাঁর খুব ডাল-ভাত-মাছ-শাক এইসব এখন পেট পুরে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি তক্তপোশের ওপরে বসে খাতাটাকে টেনে নিয়ে লিখতে লাগলেন :

ভাত ডাল শাক মাছ। শাকগাছ নয় গাছ ॥
শাক মাছ ভাত ডাল। ভাতে বাড়ে মিহি চাল ॥
ডাল ভাত মাছ শাক। শাক দিয়ে মাছ ঢাক ॥
মাছ শাক ডাল ভাত। ছড়া লিখে প্রাণপাত ॥

কিন্তু এই ছড়াটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে রাম-ডাক্তার দোতলায় উঠে এলেন, তাঁর পিছে বেশ কিছু সাহসী ও কৌতূহলী ব্যক্তি।

খ্যাপা বেড়াল এবং অথবা খ্যাপা বেড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির কামড়ানো বা আঁচড়ানো থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছেন রাম-ডাক্তার। রবারের ওয়াটারপ্রুফ বর্ষাতিতে তাঁর সারা শরীর ঢাকা, হাতে চামড়ার দস্তানা, পায়ে গামবুট।

হাতে, পায়ে, শরীরে কোথাও কামড়ানো, আঁচড়ানোর সাধ্যি হবে না কোনও মানুষের বা জন্তুর।

আসলে এটাই রাম-ডাক্তারের কলে বেরোবার পোশাক, তাঁকে প্রায়ই দুর্দান্ত রোগীকে ধরে আনতে হয়। বহু সময় চেম্বারেও তিনি এই পোশাক পরে থাকেন। এই পোশাকে শুধু শরীর বাঁচে তাই নয়, রোগী এবং রোগীর আত্মীয়েরা এই পোশাকের জন্যে তাঁকে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখে।

বৈঠকখানা ঘরের তক্তপোশ থেকে হরগোবিন্দ রাম-ডাক্তারকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখলেন, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে, অনেকদিন দেখেননি, কিন্তু এ-মুখ সহজে ভোলার নয়। কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে এসেও রামশঙ্কর যে আত্মগোপন করতে পারলেন না সেটা ভেবে হরগোবিন্দ হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

এদিকে রাম-ডাক্তারেরও কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল এ বাড়িটা। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে এই দোতলার সিঁড়িতে উঠলেন, কিন্তু এই সিঁড়ির ডানহাতি বাঁকটা তাঁর চেনা। ওই সামনের দিকে রান্নাঘর, ওখানে বসে হরের মা'র হাতের তৈরি মোহনভোগ, পায়েস, কতবার খেয়েছেন রামশঙ্কর, সে কি আজকের কথা, অথচ মনে হয় যেন গতকাল। পাশের জমিটায় একটা বুড়ো নারকেলগাছ ছিল, না এতদিন পরে সেখানে আর কিছু নেই, জানলা দিয়ে দেখলেন রামশঙ্কর, একটা বড় বাড়ি উঠেছে সেখানে, সেটাও বেশ পুরনো হতে চলল।

হরগোবিন্দকে দেখেই চিনতে পেরেছেন রামশঙ্কর এবং স্বভাবতই তাঁর অট্টহাসি শুনে তিনি মোটেই ভীত হননি। আর তা ছাড়া তিনি অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞ বিখ্যাত উন্মাদ-চিকিৎসক, এরকম অট্টহাসি শোনা তাঁর যথেষ্টই অভ্যাস। এর থেকে মারাত্মক কোনও অঘটন ঘটলেও তিনি বিচলিত হতেন না।

ওদিকে অট্টহাসির পিছনেই অপেক্ষা করছিল উষ্ণ অভ্যর্থনা। কাব্যের ঝরনা কুলকুল করে বইতে লাগল হরগোবিন্দের কণ্ঠে :

ধন্য ধন্য রাম-ডাক্তার, অপার অসীম মহিমা তোমার,
আজিকে এসেছ আমার ঘরে।
আগের মতন আজ আর আমি, করি না তো আর সাজা পাগলামি,
আমি উন্মাদ বাণীর বরে ॥

পুরনো বন্ধুর মুখে অসম্ভব পদ্য শুনে রাম-ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। পুরো উপসর্গটা তাঁর পরিচিত। এ-রকম তিনি আজকাল খুবই দেখছেন।

ততক্ষণে হরগোবিন্দ পদ্যে আরও বিস্তারিত হয়েছেন, তিনি বলে চলেছেন,

ধন্য ধন্য রামশঙ্কর, পবিত্র হল আমাদের ঘর,
আজিকে তোমার চরণ পেয়ে।
কেবা আজি পর কেই বা আপন,
এসো ব্রাহ্মণ একটু শুচি করি মন ...

এই শেষের জায়গাটায় এসে হরগোবিন্দ একটু ঘুলিয়ে গেলেন, এই শেষের জায়গাটা সেই ১৯৩০ সালে সাউথ সুবার্বন স্কুলে বাংলা বইতে পড়েছেন, পুরনো বন্ধুকে দেখে এতদিন পরে মনে পড়ে গেল। একবার মাথা ঝাঁকি দিলেন হরগোবিন্দ। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'আশ্চর্য'!

ততক্ষণে রাম-ডাক্তার নমস্কার করে ঘরের প্রান্তে দাঁড়ানো সত্যভামা দেবীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। বললেন, "আমরা দুজনে বাল্যবন্ধু। মধ্যে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর দেখাশোনা নেই। এই হরগোবিন্দের ব্যারামটা আমি ধরে ফেলেছি ওর পদ্য শুনে, লাল চোখ আর হাবভাব দেখে। আপনি শুধু আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন।"

আজ সকাল থেকে একের পর এক বিচিত্র ঘটনায় সত্যভামা হতভম্ব হয়ে গেছেন, তবুও রাম-ডাক্তারের প্রশ্নগুলির তিনি যথাসাধ্য জবাব দিলেন।

রামডাক্তার প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "হর ময়দানে ভিক্টোরিয়ার দিকে বেড়াতে যায়?" সত্যভামা ঘাড় কাত করে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" রাম-ডাক্তার উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "যেতেই হবে।" তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, "সকালে সূর্য ওঠার আগে?" সত্যভামা আবার ঘাড় কাত করলেন। এবার রামডাক্তার রীতিমত উত্তেজিত, জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কোনও অচেনা, গোল, কালো ফল খেয়েছিল?"

এই প্রশ্নের সত্যভামা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই, স্বয়ং হরগোবিন্দ জবাব দিতে এগিয়ে এলেন, তারপর সেই আগের কবিতাটা আবার বললেন :

গিয়েছিনু ময়দানে জ্ঞানবৃক্ষতল।
সেইখানে খেয়েছিনু গোলগাল ফল ॥
তদবধি চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।

এই পর্যন্ত শুনেই হরগোবিন্দকে রাম-ডাক্তার থামিয়ে দিলেন, এখন তিনি এই পদ্য শুনে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। এখন পর্যন্ত রামডাক্তার বহু পাগলের চিকিৎসা করেছেন যারা হঠাৎ কবি হয়ে গেছে এবং যাদের পায়ে ও শরীরে একটা আকস্মিক লঘুভাব এসেছে। এরা সবাই ময়দানে ভিক্টোরিয়ার কাছে বেড়াতে গিয়ে জাম ভেবে অন্য একটা অচেনা ফল খেয়েছে। প্রত্যেক বছরই গ্রীষ্মের শেষে এই রোগটা অল্পবিস্তর দেখা যায়।

রাম-ডাক্তার সব রোগীর কাছ থেকে জনে জনে জানতে চেয়েছেন গাছটা কোথায়। কেউ বলতে চায়নি, কোনও পাগল তার গোপনকথা বলতে চায় না, শুধু হাত নেড়ে নেড়ে বলেছে, 'সেইখানে খেয়েছিনু গোলগাল ফল।'

বহু পাগলকে জেরা করে এবং কিছু সরল পাগলের স্বীকারোক্তি থেকে দীর্ঘ গবেষণা করে রাম-ডাক্তার ধরতে পেরেছিলেন এই গোলগাল ফলে প্রতিক্রিয়া হয় সূর্যোদয়ের আগে এবং এটা বছরে মাত্র দশদিন ফলে ময়দানের ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি একটা গাছে।

কিন্তু তীক্ষ্ণধী রাম-ডাক্তার যতবার এ-রকম রোগী পেয়েছেন সবই ওই দশদিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে। ফলে ওই গাছটাকে আর ধরা যায়নি।

রাম-ডাক্তার আরও আবিষ্কার করেছেন, এই কাব্যরোগ ব্যাপারটা খারাপ নয়। নিজের অজান্তে চমৎকার সব সত্যিমিথ্যে কথা বলা যায়, ভাষাটা মধুর বলে কেউ কিছু মনে করে না, তা ছাড়া কবি হওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। একটু দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি আছে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা খুবই মজার।

গরিবের ছেলে রামশঙ্কর, সারাজীবন পাগল চরিয়ে খেয়েছেন, তিনি পাগল হতে চান না; কিন্তু তাঁর খুব ইচ্ছে কবি হতে। তিনি জানেন, এতকাল পরে এই সত্তর বছর বয়েসে সহসা কবি হওয়া কঠিন, কিন্তু ময়দানের ভোরবেলার মরসুমি গোলগাল ফল খেয়ে কাব্যপাগল বা পাগল-কবি হলেই বা আপত্তি কী!

রাম-ডাক্তার মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, এ-বছরে ঐ কাব্যফলের মেয়াদ এখনও একদিন আছে। সুতরাং বাল্যবন্ধু হরগোবিন্দ যদি তাঁকে গাছটা একবার দেখায় তিনিও একবার চেষ্টা করে দেখতেন। তিনি হরগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই হর, গাছটা কোথায় আছে, একবার দেখাতে পারবি?"

হরগোবিন্দ বললেন :

'ও গাছ তোমার, এ গাছ আমার,
একবার নয় বহু শতবার,
ও গাছ তোমাকে আছে দেখাবার ॥

আনন্দের আতিশয্যে রাম-ডাক্তার মাথা গরম করে ফেলতে পারতেন, কিন্তু আজ তিনি কবি হতে চলেছেন, কবি হওয়ার আগে মাথা গরম করার মানে হয় না, তিনি বললেন, "হর, কাল ভোরবেলা পর্যন্ত ঠিক থাক, আমি তোকে ডেকে নিয়ে ময়দানে যাব।'

এ গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু আরও সামান্য দু-চার কথা না বললে অন্যায় হবে।

পরদিন শুকতারা সাদা হওয়ার আগেই, হরিশ পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে প্রথম কাক ডাকবার আগেই হাজরার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাম-ডাক্তার হরিশ মুখার্জি রোডের একটা গলিতে এসে হর-ডাক্তারকে ডেকে ময়দানের দিকে চললেন।

সারারাত জেগে হরগোবিন্দ কবিতা লিখেছেন, জমাখরচের খাতা শেষ হয়ে গেছে, ধোপার খাতা, ঘরের দেয়াল সর্বত্র পদ্যে-ছড়ায় ভরে দিয়েছেন তিনি ; কিন্তু বাল্যবন্ধুর ডাক শুনে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রাত। আকাশে এখনও চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি; একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা ভেজা-ভেজা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার হয়ে দুই বন্ধু ময়দানের পাশে পড়লেন। সবুজ, নতুন ভেজা ঘাস, ডান দিকে, আর বাঁ দিকে ঝকঝকে কালো পিচের রাস্তা। পুবের থেকে নতুন বর্ষার হাওয়া বইছে।

এক জায়গায় এসে হর-ডাক্তার থেমে গেলেন, এক অতিকায় বনস্পতির নীচে ঘাসের উপরে পড়ে রয়েছে অল্প কিছু গোলগাল কালো ফল, এই মরসুমের শেষ ফসল।

দুটো ফল তুলে নিয়ে একটা বন্ধুর মুখে গুঁজে দিয়ে হর-ডাক্তার বললেন, "নে, খা।" আরেকটা নিজের মুখে পুরলেন।

তারপর ?

তারপর আর কিছু নেই। এই যে আজকাল কাগজে কাগজে এত কবিতা, কবিতা আর কবিতা ; স্বনামে বেনামে তার সিকিভাগ লেখেন হর-ডাক্তার আর সিকিভাগ লেখেন রাম-ডাক্তার, বাকি অর্ধেক কারা লেখে, কে জানে!

ছবি : দেবাশিস দেব

ডাক্তারবাবু বলছেন

শরৎকালে কী করবে

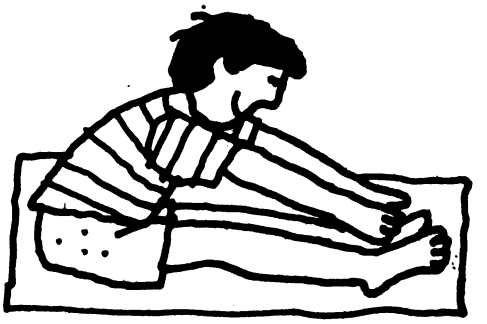

শরৎকাল এসে গেছে। আকাশ ঝকঝকে। চারদিকে ফুরফুরে বাতাস। আকাশে বাতাসে একটা পুজো-পুজো আমেজ। এরই মধ্যে কখনও-কখনও দু' এক পশলা বৃষ্টিও হচ্ছে।

এই সময় একটু সাবধানে থাকতে হয়। বাইরে ঠাণ্ডার আমেজ আছে বটে, কিন্তু শরীরের ভেতরটা সে-ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে ওঠেনি। সেইজন্যে সর্দি, কাসি, জ্বরজ্বর-ভাব, গা হাত পা ম্যাজম্যাজ করে।

শরৎকালে ঘুম থেকে উঠে, বিছানা ছাড়ার আগে একটা ব্যায়াম করবে। এ ব্যায়াম ছেলেরাও করতে পারে, মেয়েরাও পারে। প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে দেবে। তারপর হাত দুটো কানের পেছনে নিয়ে যাবে। পা সোজা করে জোড়া করে ছড়িয়ে দেবে, তারপর শরীরের উপরের অংশ ভাঁজ করে হাতের আঙুল দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবে। দেখো, হাত যেন কানের সামনে না আসে। আর হাঁটু যেন ভাঁজ না হয়। পনেরো-কুড়িবার এইভাবে করবে। প্রথম-প্রথম পারবে না। অসুবিধে হবে। কিন্তু কিছুদিন অভ্যেস করলেই দেখতে পাবে অনায়াসে করতে পারছ। এই ব্যায়াম কোনওদিন ছেড়ো না, দেখবে খুব ভাল হজম হচ্ছে, অযথা মোটা হচ্ছ না, আর লেখাপড়া খেলাধূলোতে খুব উৎসাহ পাচ্ছ।

এই ব্যায়াম করতে গিয়ে যদি ঘেমে যাও, ব্যায়ামের শেষে ভাল করে গা হাত পা মুছে নেবে। শরীরের কোথাও যেন ঘাম লেগে না থাকে।

শরৎকালে স্নান করার আগে সারা গায়ে ভাল করে তেল মেখে স্নান করবে। যে-কোনও তেল মাখতে পারো। তবে খাঁটি তেল হলে ভাল হয়।

এই সময় একেবারে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা উচিত না। অল্প গরম জল মিশিয়ে নিয়ে আগে হাত চুবিয়ে দেখে নেবে তোমার শরীরের উত্তাপের সমান গরম হয়েছে কি না। খুব গরম জল কিংবা খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে না। ভাল করে তেল মেখে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করলে শরীর ঝরঝরে থাকবে এবং তখন দেখবে কোনও রোগও তোমার পাশ ঘেঁষবে না।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

ধাঁধা

ছোট্‌কার মাথায় কী থেকে যে কী খেলে যায়, বোঝা কঠিন। যেমন, আজ বিকেলের কথাই ধরা যাক। ছোড়দির জন্মদিন ছিল। খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিনেছে ছোড়দি। সেটা পরে ছোড়দি গিয়েছে ছোট্‌কাকে প্রণাম করতে। ছোট্‌কা বহুক্ষণ ধরে শাড়িটা দেখল। কী যেন ভাবল মনে মনে। তারপর বলল, "ফাইন হয়েছে শাড়িটা। এর মধ্যে একটা রুচির ছাপ আছে। আর আছে আই কিউ। ভেরি গুড।" বলে আশীর্বাদ করল ছোড়দিকে।

এই শেষ কথাটা শুনে ছোড়দি অবাক। শাড়িতে রুচির ছাপ আছে, এই অবধি বোঝা যায়। কিন্তু শেষ কথাটা কী বলল ছোট্‌কা ? আই কিউ আছে ! সে আবার কী ? আই কিউ তো বুদ্ধির পরীক্ষা, বড়জোর মগজে থাকবে, কিন্তু শাড়িতে আসবে কীভাবে ?

সারা বাড়িতেই একটা চাপা হইচই ছড়িয়ে গেল। কেউ বুঝতে পারছে না ঠিক কী বলেছে ছোট্‌কা, মানে, কী বোঝাতে চেয়েছে। অবশেষে, রাত্তিরে খেতে বসে ছোট্‌কা নিজেই বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। আর যখন ভেঙে বলল, তখন প্রত্যেকে হেসে আকুল। এই না হলে ছোট্‌কার মাথা। কী থেকে কী খেলে গিয়েছে মাথায়।

ব্যাপারটা হল, ছোড়দির শাড়িটায় অন্য রঙের কাপড় কেটে কেটে গোলাপফুল জুড়ে দেওয়া ছিল। সারা শাড়ি জুড়ে এমন সব অ্যাপ্লিকের কাজ। আর সেই applique শব্দটার মধ্যে 'আই' আর 'কিউ' যেহেতু পাশাপাশি রয়েছে তাই ছোট্‌কা বলেছে কথাটা। দারুণ ব্যাপার। তাই না ?

কী, তোমাদেরও মজা লাগছে তো। বেশ, তাহলে এবারের প্রথম ধাঁধাটায় ওই রকমই আই কিউ-র একটা পরীক্ষা হোক। পাঁচটা শব্দ বাংলায় দেওয়া হল। তার ইংরেজি প্রতিশব্দ বলতে হবে, যে-কোনও শব্দ হলে চলবে না, প্রত্যেকটায় যেন আই কিউ থাকে। বুঝলে ?

প্রথম ধাঁধা ॥ নীচের শব্দগুলোর আই কিউ-বিশিষ্ট ইংরেজি বলো—

(ক) অদ্বিতীয়। (খ) তরল। (গ) শিষ্টাচার। (ঘ) কটু। (ঙ) তির্যক।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ইংরেজি I.Q. শব্দের আসল শব্দযুগল কী কী ? অর্থাৎ পুরো শব্দ দুটো বলো, যার থেকে সংক্ষেপে I.Q.

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও। না, জাপানি শব্দ নয়, বাংলা শব্দ।

চোনানিকাবানি

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১৮টা। (২) গর্তে মাটি থাকবে কেন ? (৩) দশমহাবিদ্যা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

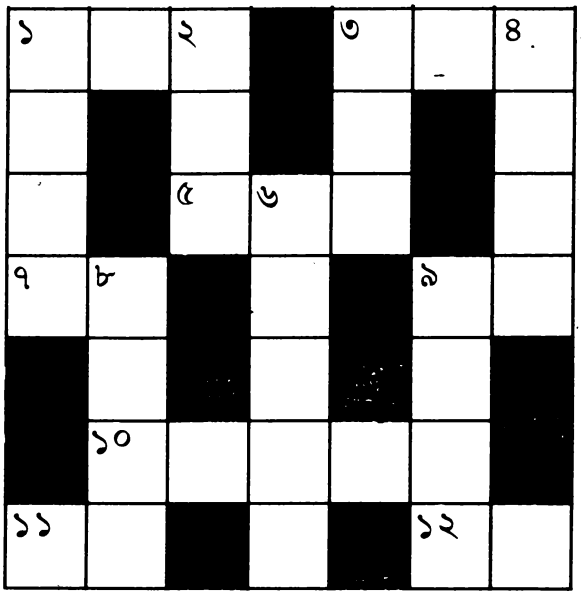

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পুরাণে বর্ণিত সিন্ধুঘোটকবিশেষ। (৩) হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। (৫) দক্ষ। (৭) তাঁত বুনতে লাগে। (৯) ডানাকাটা হলেই পরমাসুন্দরী। (১০) ভীম-কর্তৃক নিহত রাক্ষস। (১১) বাঁশ থেকে তৈরি পর্দাবিশেষ। (১২) নাকের গহনা।

উপর-নীচ : (১) গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবকে কী দিয়েছিলেন ? (২) বেগুন। (৩) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (৪) চোর-পুলিশ খেলা। (৬) মুসলমান পর্ববিশেষ। (৮) একটি ফুলের নাম। (৯) যোগাসনবিশেষ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

নৃ	প	তি	■	মা	ন্দা	স
সি	■	লো	হি	ত	■	হ
ং	■	ত্ত	■	ব্ব	■	কা
হ	■	মা	দু	র	■	র
■	শ্বা	■	রা	■	ক	■
■	প	দ	চা	র	ণা	■
খা	দ	■	র	■	দ	র্প

রঞ্জন

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার উপকরণ অতি সামান্য। শুধু কাগজ আর **পেনসিল**। আর, মজা করার জন্য দু-চারজন বন্ধু। বন্ধুদের সামনে খেলাটা বারবার এঁকে দেখাতে হবে কেন, তার চেয়ে একটা মোটা কাগজে কালি দিয়ে নীচের ছবির মতন একটা ছবি বরং এঁকেই নাও—

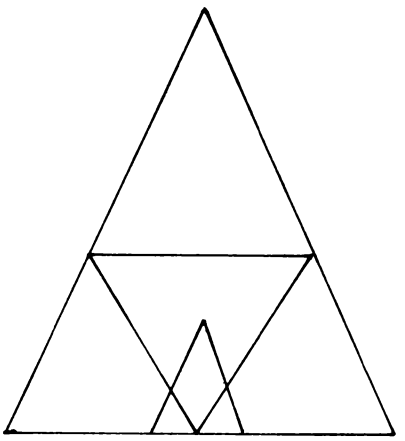

এঁকেছ ? এবার বন্ধুদের কাউকে বলো, সে যেন পেনসিল দিয়ে এমনভাবে আরেকটা কাগজে এই ছবিটা আঁকে, যাতে এক লাইনের ওপর দিয়ে দু'বার পেনসিল না যায় এবং পেনসিল একবারও না তোলে।

দেখবে, বন্ধুরা কী-রকম গোলমালে পড়বে। এক টানে, পেনসিল না তুলে, এক দাগের ওপর দিয়ে দু'বার না গিয়ে, ছবিটা আঁকা যত সহজ ভাবছ মোটেও তত সহজ নয়। তবে কিনা, যার জানা আছে, অথবা যার দারুণ বুদ্ধি, সে পারবে।

আর যে পারবে, তার উত্তরটা হবে এই রকম—

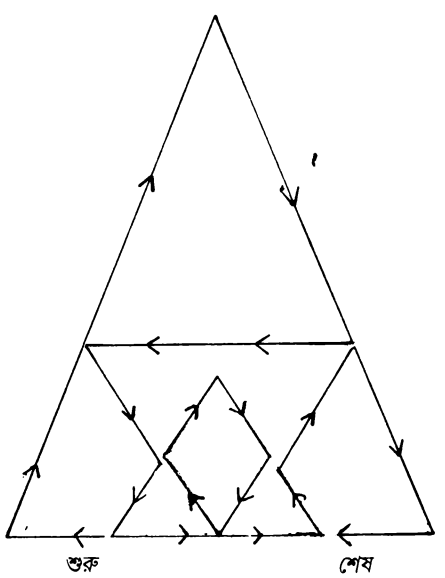

মজারু

হাসিখুশি

"দাদুর পুরনো সিন্দুকে অনেকগুলো মুক্তো পেয়েছি। ওগুলো কী করব বলুন তো ?"

"মালা গেঁথে একটা বাঁদরের গলায় পরিয়ে দাও।"

"খাব কী করে ? প্লেটের সমস্ত খাবারই তো নকল !"

"আপনার দাঁতগুলোও যে নকল !"

"অলংকার কাকে বলে পিকলু ?"

"যা চুরি যাওয়ার ভয়ে বাইরে পরে বেরনো যায় না, স্যার।"

"যে সমস্ত কিছুই খায়, সে হল সর্বভুক্। একটা উদাহরণ দিতে পারো ?"

"হ্যাঁ, স্যার। ছাগল।"

"খাঁটি গোরুর দুধ বলে যা দিলেন, তার তো দেখছি পুরোটাই জলে ভর্তি।"

"গোরুটা খাঁটি, দুধটা তো খাঁটি বলিনি !"

"ন্যাড়া বেলতলায় নিশ্চিন্তে বসে আছে দেখলাম। ওর কি একটুও প্রাণের ভয় নেই ?"

"থাকবে কেন ? গাছে যে একটাও বেল নেই !"

"দুই পদের মিলনকে সন্ধি বলে, লিখেছ। এখন একটা উদাহরণ দিতে পারো পাপান ?"

"আপদ আর বিপদ।"

ছবি : দেবাশিস দেব

“একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে নিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!”—

ফেভি ফেয়ারী

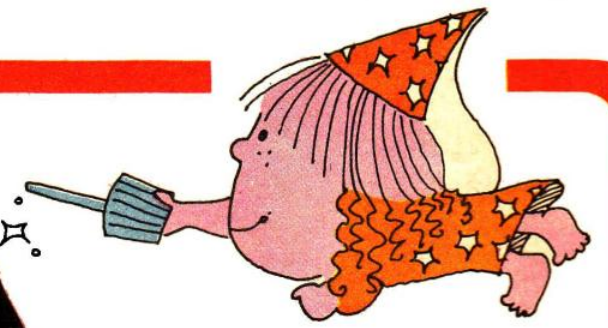

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি--বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

পোর্কি পিগ কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: “ফেভি ফেয়ারী”, পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

পোর্কি পিগ কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: “ফেভি ফেয়ারী”, পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

____

সহর: ____________________

রাজ্য: __________ পিনকোড: __________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফ্‌ট পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না

(A)

®

ফেভিকল এম-আর

সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি -আর ফেভিকল ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-5572 BN

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

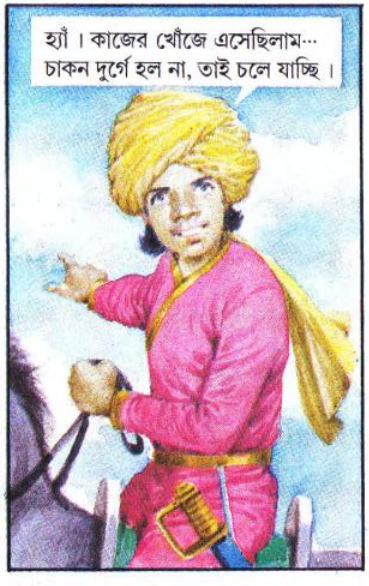

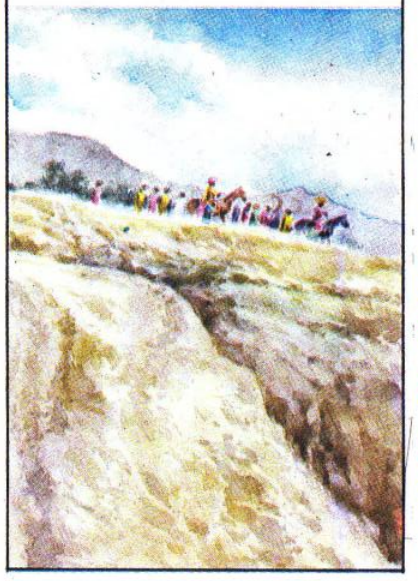

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—দাম খুবই কম।

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568/R/BEN

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। রাত্তিরে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন জ্বলে। তার অর্থ জানে বুধুয়া-বুড়ো। সায়ন একটা সওয়ারহীন ঘোড়ায় উঠেছিল। ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে নানা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে সায়ন ছিটকে পাড়ে পড়ে যায়। সেখানে যে-লোকটি তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচায়, সে বাংলা জানে। লোকটির পোষা-হনুমানের নাম ইন্দ্র। ডায়েরি দেখে সায়ন জেনেছে, লোকটির নাম সুধাময় সেন। তার ব্যাগের মধ্যে রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ছবি। তারপর···

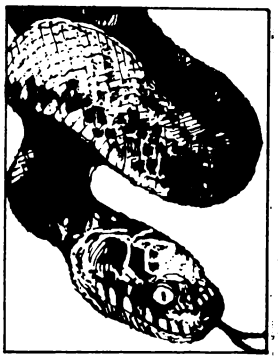

এখানে সন্ধে হয়ে গেলেও চট করে রাত নামে না। পায়ের নীচে জঙ্গলে যখন ঘুটঘুটে অন্ধকার তখন এই পাহাড়ের ওপর একটা মরা ছায়া নেতিয়ে থাকে। আকাশের নিজস্ব চোরা আলো আছে। বোধহয় সারাদিন সূর্যের আলো মেখে-মেখে সেটা তৈরি করে নেয় আকাশ। আর এই সময়ে সেই আলোটা নেমে আসে পাহাড়ের গায়ে। চারপাশে রাতের আমেজ, পাখিরা চিৎকার করছে নীচের গাছের মাথায়, কোনও নাম না জানা জন্তু ডেকে যাচ্ছে একটানা, আর সায়ন চুপচাপ তিরতিরে আলোয় বসে শুনছে, দেখছে। এই সময় ইন্দ্র শব্দ করে উঠতেই সে চোখ তুলল।

ইন্দ্রের হাতে কাঠের পাত্রগোছের কিছু। তাতে কিছু সেদ্ধ মাংস আর কলা। পাত্রটা নামিয়ে দিয়ে হনুমানটা নিঃশব্দে চলে গেল। সায়নের খেয়াল হল অনেকক্ষণ লোকটাকে দেখতে পায়নি। ওর জিনিসপত্রে সে হাত দিয়েছিল এটা টের পেয়েছে কি না কে জানে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি দেখার পর থেকেই লোকটির সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করছিল।

এখনকার মাংসটা নরম। কিন্তু কোনও স্বাদ নেই। সামান্য নুন ছড়িয়ে দেওয়ায় খাওয়া যাচ্ছে এইমাত্র। সায়ন খাওয়া শেষ করে তাকিয়ে দেখল নীল আকাশের গায়ে তারা উঠেছে। ঠিক ছবির মতো। আকাশটা এত পরিষ্কার যে,মনে হচ্ছে কেউ যত্ন করে নিকিয়ে রেখেছে। তারাগুলো কেমন টলটল করছে।

সায়ন উঠল। তার পায়ের ফোলা এখন অনেক কম। কিন্তু ভর দেওয়া যাচ্ছে না পাতায়। বেশ ব্যথা আছে। গুহার মধ্যে ঢুকতেই মনে হল, দম বন্ধ হয়ে যাবে। তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে ভেতর থেকে।

"মিনিট পনেরো অপেক্ষা করো।"

ঘাড় ঘুরিয়ে সায়ন দেখল লোকটি বসে আছে একটা পাথরে হেলান দিয়ে। তার হাতে ডায়েরি। কোনও কলম বা পেনসিল চোখে পড়ছে না। সায়ন জিজ্ঞেস করল, "কিসের গন্ধ ?"

"ধোঁয়ার। গুহার একদম শেষ প্রান্তে উনুন জ্বালি। মাংসগুলোকে সেদ্ধ করে খেতে হবে তো ? ধোঁয়া যাতে এদিকে না আসে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। গুহার মধ্যে ওটা জমে থাকে অনেকক্ষণ, পেছনের পথ দিয়ে অবশ্য খানিকটা বের হয়ে যায়। একদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বটে, কিন্তু উপকারও করছে। মশা থাকছে না।"

"বাইরে উনুন ধরান না কেন ?"

"বাইরে ?" লোকটি হাসল, "কদিন থাকলেই জানতে পারবে।" বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। সায়ন বুঝতে পারছিল না এর মধ্যে রহস্য কী থাকতে পারে।

তাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি ডাকল, "এদিকে এসো। হাঁটতে পারছ এখন ?" হাত বাড়িয়ে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল।

সায়ন বসতেই সে জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স তোমার ?"

উত্তরটা শুনে হাসল লোকটা, "তোমরা যে জায়গাটায় থাকো তার নাম কী ?"

সায়ন নাম বলল। তারপর নিচু গলায় অনুনয় করল, "আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আমি তো তোমার বাড়ির পথ চিনি না।"

"আপনি ঘোড়ার পিঠে চেপে কোনওদিন আমাদের চা-বাগানের দিকে যাননি ?"

"চা-বাগান ? ব্রিটিশদের চা-বাগান ? নাঃ।"

"ব্রিটিশদের হতে যাবে কেন ? ওটা আমাদের নিজস্ব চা-বাগান।"

"না, আমি এই জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের পথ চিনি না, চিনতে চাই না।"

"কিন্তু আপনার ঘোড়াটা তো আমাদের বাগানে গিয়েছিল।"

"সেইটেই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।"

"আপনি এই জঙ্গলে থাকেন কেন ?"

"সেটা খুব বড় গল্প। শুধু জেনে রাখো, ব্রিটিশরা আমাকে পেলে ছাড়বে না। তোমার এখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগল ?' লোকটির চোখে উদ্বেগ।

"অনেকক্ষণ"।

"এইটেই আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে। জঙ্গলটা এত ছোট হয়ে গেল কী করে ! আমি তো জানতাম ইণ্ডিয়া এখান থেকে অন্তত দু'দিনের পথ।" লোকটি স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন।

"ইন্ডিয়া ? ভারতবর্ষ বলুন।"

"ব্রিটিশরা তো ইন্ডিয়া বলে। সেটা শুনতেই অভ্যস্ত ছিলাম। বাড়িতে তোমার আর কে কে থাকেন ?" লোকটি যেন প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছিল।

"মা আর বাবা। আমি অবশ্য হোস্টেলে থাকি।"

"তাই। এখানে এসে তুমি কান্নাকাটি করোনি, কেননা তোমার মা-বাবাকে ছেড়ে থাকার অভ্যেস আছে। আজ কত তারিখ জানো ?"

সায়ন মনে করার চেষ্টা করল। এই একদিনেই সব গুলিয়ে গেছে যেন। তারিখটা শুনে চমকে উঠল লোকটা। কিছুক্ষণ

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। তারপর অবিশ্বাসী স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো ? এটা উনিশশো পঁচাশি ?" লোকটার চোখ-মুখ কেমন বদলে গেল।

সায়ন করুণ স্বরে বলল, "আমি রসিকতা করব কেন আপনার সঙ্গে ? আপনি একটা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেই জানতে পারবেন।"

"ক্যালেন্ডার ? এখানে ক্যালেন্ডার পাব কোত্থেকে ? এটা পঁচাশি সাল ? আশ্চর্য!" মনে-মনে যেন হিসেব চলছিল।

সায়নের মনে হল লোকটার চেহারায় বেশ বিমর্ষ ছায়া নামছে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে কত দিন আছেন ?"

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটি। তারপর ঠোঁট চেটে বলল, "চল্লিশ বছরের বেশি।" চোখ বন্ধ করে নিশ্বাস নিল লোকটি। তারপর নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "গান্ধীজি এখনও বেঁচে আছেন ?"

"গান্ধীজি ?"

"তুমি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম শোনোনি ?"

সায়নের মনে পড়ল। দোসরা অকটোবর তাদের স্কুল ছুটি থাকে। সে বলল, "ও, মহাত্মা গান্ধী ? উনি তো মারা গেছেন। ওঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল।" ইতিহাসের বই নয়, বাবার কিনে দেওয়া মনীষীদের জীবনীটা মনে করল সায়ন। সে লক্ষ করল লোকটির মুখ হাঁ হয়ে গেল, "কী বলছ, তুমি ! ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত ওঁকেও গুলি করে মেরেছে ?"

"বাঃ, ইংরেজরা মারতে যাবে কেন ? আপনি কি কোনও খবর রাখেন না ?" সায়ন প্রশ্নটা করামাত্র লোকটি খপ করে তার হাত ধরল, "বিশ্বাস করো, চল্লিশটা বছর আমি এইরকম পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। দেশে কি হয়েছে না হয়েছে, আমি কিছুই জানি না। কে মেরেছে গান্ধীজিকে ?"

"নাথুরাম গড্‌সে বলে একজন।"

"কেন ?"

এবার হোঁচট খেল সায়ন। নাথুরাম কেন মেরেছিল সেই খবর বইটাতে ছিল না। সে বলল, "আমি অত জানি না। উনি যখন প্রার্থনা করছিলেন তখন মারা হয়েছিল।"

"জওহরলাল ছিলেন না ? তিনি কী করছিলেন ? ভাবতেই পারছি না। এখন কি দেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনওরকম আন্দোলন হয় না ?

লোকটির মুখে অদ্ভুত একটা অবজ্ঞা দেখতে পেল সায়ন। কিন্তু প্রশ্নটা শুনে সে আরও অবাক হল, "ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে যাবে কেন ? এখন তো আমাদের দেশ স্বাধীন।"

"স্বাধীন !" চমকে উঠল লোকটি, "কী বলছ তুমি ? ভারতবর্ষ স্বাধীন ?"

"এ মা ! কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।" গর্বিত গলায় বলল সায়ন।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল লোকটি। তারপর খপ করে সায়নের জামার কলার মুঠোয় ধরে টেনে আনল কাছে, "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করলে ফল খুব খারাপ হবে। সত্যি কথা বলো।"

সায়ন খুব অবাক হয়ে গেল এই রকম ব্যবহারে। সে হাঁসফাঁস করতে-করতে বলল, "আমি মিথ্যে বলতে যাব কেন ? আপনি যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন সত্যি বলছি কি না।"

লোকটির হাতের মুঠি আলগা হল। যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে এমন ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। সায়নের খুব রাগ হচ্ছিল তাকে ওইভাবে ধরার জন্য, কিন্তু কান্না দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। ওই রকম বৃদ্ধ মানুষ, যদিও বৃদ্ধ মনে হয় না, কিন্তু বয়স হয়েছে একথা ঠিক। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে-ফুলে কাঁদছে, দেখতে তার খুব খারাপ লাগছিল।

কিছুক্ষণ বাদে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কাঁদছেন কেন ? কী হয়েছে ?" নিজেকে সংযত করতে লোকটার অনেক সময় লাগল। তারপর নিজের মনেই বলল, "উনিশশো পঁচাশি। তার মানে আটত্রিশ বছর হল ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না। আমি ভাবতাম এখনও আমরা পরাধীন।"

বড় একটা নিশ্বাস ফেলল সে। খুব করুণ দেখাচ্ছিল তাকে।

এই সময় শব্দ উঠল। কোন ফাঁকে রাত নেমেছে আকাশে। সেই চোরা আলো শুষে নিয়েছে নীল অন্ধকার। অত্যন্ত শান্ত এবং নির্জন হয়ে গেছে চরাচর। আর এসব লক্ষই করেনি সায়ন। এখন শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র সে মুখ ফেরাল। আর তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটি। পা বাড়াতে গিয়েও ফিরে এসে ফিসফিস করে বলল, "এখান থেকে এক পা-ও নোড়ো না। যদি ঘুম পায় গুহায় গিয়ে শুয়ে পড়তে পারো।। ওখানে আর গন্ধ নেই। যারা শব্দ করছে তারা খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।" কথাগুলো বলেই নিঃশব্দে সরে গেল লোকটি। সায়নের মনে হল এই মানুষটির সঙ্গে একটু আগে যে মানুষ কাঁদছিল তার কোনও মিল নেই।

শব্দটা মিলিয়ে গিয়েছিল। সায়নের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। পাহাড়ের যে-দিকটায় যেতে লোকটা নিষেধ করেছে, সেই দিকে গেলেই বোধহয় ব্যাপারটা দেখা যাবে। কিন্তু লোকটা যদি ওখানে থাকে ? নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে। এবং এই জঙ্গলে যদি তাকে একা ছেড়ে দেয়, তা হলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু লোকটা কে ? যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ছবি রাখে, সে জানে না ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে ? এটাই আশ্চর্য ব্যাপার ? এমনকী গান্ধীজির মৃত্যু-সংবাদটাও জানত না ! এবার নিজের বোকামিটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। যে সাতচল্লিশ সালের ঘটনা জানে না, সে কী করে আটচল্লিশ সালের কথা জানবে ? তার মানে লোকটি এতগুলো বছর ধরে জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সভ্য জগতের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আবার নেই বা বলা যায় কী করে ? কাঠের যে পাত্রগুলোয় খাবার দেওয়া হয়েছিল তা ও পেয়েছে কোত্থেকে ? নিশ্চয়ই আগাগোড়া নেই ওগুলো ! সায়নের ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না।

ঠিক তখন আবার শব্দ উঠল। যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কান খাড়া করে শুনে তেমনই মনে হল সায়নের। যেন ছুটে-ছুটে অনেকটা পথ এসে আচমকা থেমে গেল পা'গুলো। সায়ন উঠল। তারপর সন্তর্পণে পাহাড় ধরে এগোতে লাগল।

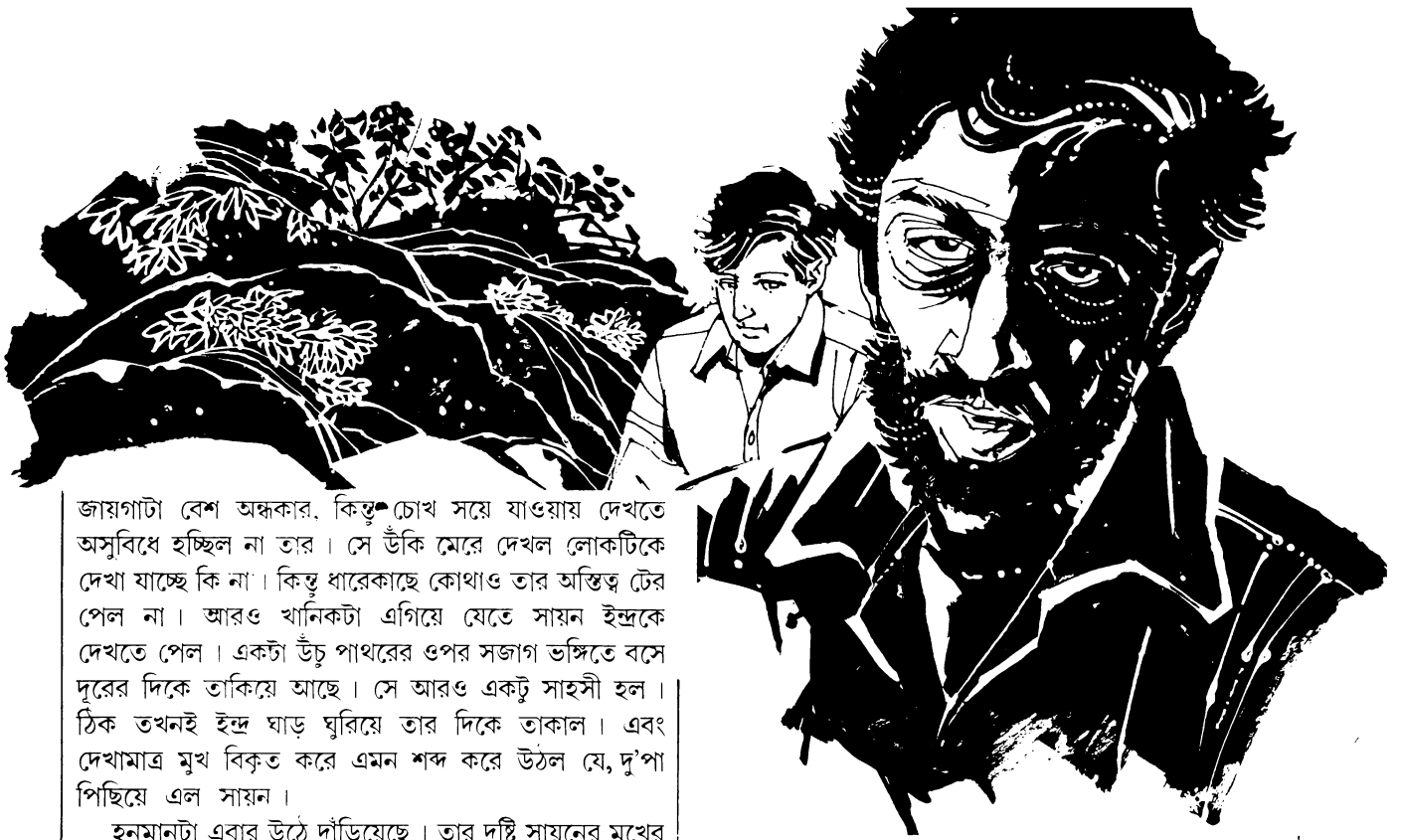

জায়গাটা বেশ অন্ধকার, কিন্তু চোখ সয়ে যাওয়ায় দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না তার। সে উঁকি মেরে দেখল লোকটিকে দেখা যাচ্ছে কি না। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও তার অস্তিত্ব টের পেল না। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে সায়ন ইন্দ্রকে দেখতে পেল। একটা উঁচু পাথরের ওপর সজাগ ভঙ্গিতে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে আরও একটু সাহসী হল। ঠিক তখনই ইন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। এবং দেখামাত্র মুখ বিকৃত করে এমন শব্দ করে উঠল যে, দু'পা পিছিয়ে এল সায়ন।

হনুমানটা এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি সায়নের মুখের ওপর থেকে সরছে না। সায়ন ভয় পেল। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে কয়েক পা এগিয়ে গেলে ও কামড়ে দিতেও পারে। সে ধীরে-ধীরে পিছিয়ে এল। তারপর গুহার মুখটায় ফিরে নিশ্বাস নিল। লোকটি কি ইন্দ্রকে পাহারা দেবার কাজে রেখে কোথাও গিয়েছে। যে ইন্দ্র তাকে খাবার দিয়েছিল তার সঙ্গে এই মুখ-ভ্যাংচানো ইন্দ্রের কোনও মিল নেই। লোকটি গেল কোথায়? ওই শব্দের সঙ্গে কি কোনও যোগাযোগ আছে? সায়ন মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিল না। সে স্থির করল পা ঠিক হয়ে গেলেই এখান থেকে পালিয়ে যাবে। ওই নদীটা পেরিয়ে যেতে পারলে পায়ে হেঁটে-হেঁটে একসময় ঠিক চা-বাগানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আর যদি কোনওরকমে সেই ঘোড়াটাকে ম্যানেজ করা যায় তা হলে তো কথাই নেই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, চোখ মেলতেই সায়নের খুব শীত করতে লাগল। এখন নিশ্চয়ই অনেক রাত। একটা বুনো জন্তু ডেকে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত মনে হয় আলগা হয়ে এসেছে। সায়ন উঠে বসল। এবং তখনই সে লোকটাকে দেখতে পেল। একটা পাথরে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে এখন ওকে। এত রাত্রেও লোকটা ঘুমুচ্ছে না কেন? সায়ন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল। অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা চোখ জ্বলছে। ঠিক একচোখো রাক্ষসের মতো। আগুনটা এখন ছোট হয়ে এসেছে, যেন কুমুদিনীর মাথার সিঁদুর-টিপের আয়তন নিয়েছে। নির্ঘাত অনেকক্ষণ জ্বলতে-জ্বলতে এখন আগুন নিভে যাওয়ার অবস্থায় এসেছে। সায়ন চমকে উঠল। বুধুয়া-বুড়ো যাকে বলত শয়তানের চোখ, এও কি সেই রকম? এই আগুনই কি সে তাদের বাংলোর বারান্দা থেকে দেখতে পেয়েছিল? তা হলে তো তাদের বাগান থেকে এই জায়গার দূরত্ব খুব বেশি নয়। চেয়ে থাকতে-থাকতে আগুনটা টুপ করে নিভে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়টায় ধুম-অন্ধকার ছড়িয়ে গেল।

"ঘুম ভেঙে গেল সায়ন?"

প্রশ্নটা শুনে সায়ন লোকটির দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমাকে বাড়িতে যেতে দিন।"

"আমি তো তোমাকে আটকে রাখিনি। তোমার পা ঠিক হলে যদি যেতে পারো তো চলে যাও, আমি কিছু বলব না।" লোকটা উদাস গলায় বলল।

"আপনার ঘোড়াটা আমাদের বাগানের পথ চেনে।"

"সে নেই। আজ একটা গোখরোর কামড়ে বেচারা মরে গেছে।"

"মরে গেছে?" চমকে উঠল সায়ন। ওই ঘোড়াটা তার জীবন বাঁচিয়েছিল। তাকে একটা গোখরো সাপ মেরে ফেলল!

"সায়ন, এখানে এসো।" লোকটি তাকে খুব নরম গলায় ডাকল। সায়নের মনে হল ঘোড়াটা মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছে লোকটি। তা হলে তখন যে পায়ের শব্দ হচ্ছিল তা এই ঘোড়াটারই? তাই যদি হয় লোকটি কাদের কথা বলে সতর্ক হচ্ছিল? কিন্তু এসব চিন্তা না প্রকাশ করে সে লোকটির সামনে গিয়ে বসতেই দেখল ইন্দ্র একপাশে খুব আরাম করে ঘুমুচ্ছে। লোকটি বলল, "তুমি বললে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। তা এখন সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক কে? জওহরলাল নেহরু?"

"রাষ্ট্রনায়ক?" চট করে অর্থটা বুঝতে পারল না সায়ন।

"দেশের নেতা। রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী। নেহরুর তো হওয়ার কথা।"

"জওহরলাল নেহরু তো অনেক দিন আগে মারা গেছেন।

তাঁর জন্মদিনে আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠান হয়। এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী হলেন রাজীব গান্ধী।"

"তিনি কে ?" লোকটি খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে।" এত **সাধারণ সংবাদ লোকটি** জানে না বলে বেশ মজা লাগছিল সায়নের। সে এবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো কোনও খবর রাখেন না। আপনি কে ?"

লোকটি ছোট চোখে সায়নের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। এইটুকু বয়সে তুমি কত কিছু খবর রাখো। তা ছাড়া আচমকা ঘোড়ার পিঠে চেপে এই অজানা জঙ্গলে এসে পড়েও তুমি ঘাবড়ে যাওনি। খুব ভাল। তুমি এলে বলেই আমি কতদিন পরে বাংলা কথা বলার সুযোগ পেলাম। জানো, আমি যাতে মাতৃভাষাটা না ভুলে যাই তাই নিয়মিত নিজের সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে, এই গাছ-পাহাড়ের সঙ্গে জোরে-জোরে বাংলায় কথা বলে যেতাম। তুমি এলে বলে আমার খুব ভাল লাগছে। তোমাকে সব কথা বলা যায়।"

লোকটি নিশ্বাস নিল। মনে হচ্ছিল ওর বুক খুব ভারী হয়ে গেছে কোনও কারণে, একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল তাই। লোকটা কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারাগুলোকে দেখলে মনে হবে এই বুঝি খসে পড়ল। রাত যত শেষ হয়ে আসে তত তারাগুলো আঠা শেষ হয়ে যাওয়া টিপের মতো আলগা হয়ে যায়। লোকটি সেইভাবেই মুখ তুলে বলল, "আমার নাম সুধাময় সেন। কলকাতার দর্জিপাড়ায় আমার বাড়ি ছিল।"

"আপনি এই জঙ্গলে—"

"প্রশ্ন করো না। আমাকেই বলতে দাও। বার্মাতে আমার মামার বাড়ি ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তখন ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন চলছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা প্রাণ দিচ্ছে প্রাণ নিচ্ছে। অন্যদিকে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন করছেন। আমি যাতে এসবের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ি তাই আমাকে বার্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইখানে একদিন শুনলাম সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করছেন। সময় নষ্ট না করে আমি যোগ দিলাম ফৌজে। আমরা লড়াই করেছি শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে। তারপর জঙ্গলে থাকতেই খবর পেলাম আমরা হেরে গেছি। ব্রিটিশরা বেধড়ক পিটিয়েছে আমাদের। বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে কোর্ট মার্শালের জন্যে। প্রাণ থাকতেও ধরা দেব না বলে পালালাম। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা-একা পালিয়েই বেড়াচ্ছি বছরের পর বছর, জঙ্গল আর পাহাড়ে। জানতাম আমাকে পেলে ব্রিটিশরা ছাড়বে না। ওদের একটা ঘাঁটি আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম যে ! ভারতবর্ষের দিকে যেতে আমি সাহস পাইনি ভাই।" কথা শেষ করে ঠোঁট কামড়ালেন সুধাময় সেন।

অবাক হয়ে শুনছিল সায়ন। এবার ফশ করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে দেখেছেন ?"

সুধাময় সেন মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি।"

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

মণিমুকুট

সার আর্থার কোনান ডয়েল

একদিন সকালবেলায় আমি আমাদের দোতলার বসবার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখছিলুম।

"হোমস, দেখে যাও একজন পাগল রাস্তা দিয়ে কীরকম ভাবে এদিকে আসছে। আমি বুঝতে পারছি না যে কোন্ আক্কেলে এর আত্মীয়স্বজন একে একলা রাস্তায় বেরুতে দিয়েছে।"

আমার কথা শুনে হোমস গড়িমসি করে তার নিজের আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ড্রেসিং-গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। ফেব্রুয়ারি মাসের ভারী সুন্দর ঝকঝকে সকাল। গতকাল রাত্রে তুষারপাত হয়েছিল। আজ সকালে সেই জমাট বরফের ওপর রোদ পড়ে চকচক করছে। বেকার স্ট্রিটের মাঝবরাবর ক্রমাগত গাড়ি যাতায়াত করায় বরফের রঙ ঘোলাটে কাদা-কাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ফুটপাথের দু'ধারে জমে-থাকা বরফ ধপধপে সাদা, যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ। ফুটপাথের ওপরের বরফ অবশ্য ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। আর সেইজন্যে ফুটপাথ এখন সাংঘাতিক রকমের পিছল হয়ে রয়েছে। তাই রাস্তায় লোকজনও বেশি চোখে পড়ছে না। মেট্রোপলিটান স্টেশনের দিক দিয়ে বেকার স্ট্রিট ধরে একটি লোকই আসছিল। আর তার খ্যাপাটে হাবভাব দেখে আমি ওই কথাগুলো বলে ফেলেছিলুম।

দেখে মনে হল লোকটির বয়েস গোটা-পঞ্চাশেক তো হবেই। বেশ মোটাসোটা লম্বা চেহারা। শরীরের তুলনায় ভদ্রলোকের মুখটা খুবই বড়। দেখলে বেশ সমীহ হয়। ভদ্রলোকের জামাকাপড় বেশ দামি। আর একটু বেশি রকম কেতাদুরস্ত। ভদ্রলোক কালো ফ্রককোট আর সাদাটে ছাইরঙের ট্রাউজার্স পরেছিলেন। মাথার টুপিও বেশ চকচকে। তবে ভারিক্কি চেহারা আর দামি পোশাকের সঙ্গে তাঁর হাবভাব চলন কোনওটাই খাপ খাচ্ছিল না। তিনি রীতিমত জোরেই দৌড়চ্ছিলেন আর থেকে-থেকে ছোটখাটো লাফ দিয়ে উঠছিলেন। ছুটতে-ছুটতে তিনি কখনও হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ছিলেন, কখনও বা মাথা নাড়ছিলেন আর কখনও-কখনও নানারকম মুখভঙ্গি করছিলেন।

"এ লোকটির কী ব্যাপার বলো তো?" আমি হোমসকে জিজ্ঞেস করলুম। "মনে হচ্ছে ও কোনও বাড়ির নম্বর খুঁজছে।"

হাতের তেলোদুটো ঘষতে ঘষতে হোমস বললে, "আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক এখানেই আসছেন।"

"এখানে? মানে আমাদের কাছে?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে লোকটি কোনও ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছে। বন্ধু, এ-সব লক্ষণ আমি দেখলেই চিনতে পারি। কী হে, আমি বলিনি?"

হোমস যখন আমাকে এই কথাগুলো বলছিল তখনই ভদ্রলোকটি হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে এত জোরে দরজার ঘন্টাটা বাজালেন যে, মনে হল, সমস্ত বাড়িটাই যেন ঝনঝন করে উঠল।

আর একটু পরেই সেই রকম পাগলের মতো হাত নাড়তে নাড়তে আর হাঁফাতে হাঁফাতে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢুকলেন। দূর থেকে ভদ্রলোকের রকমসকম দেখে আমাদের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে এমন একটা কষ্টের আর হতাশার কালো ছোপ পড়েছিল যে, তা দেখে আমাদের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। ভদ্রলোকের জন্যে দুঃখ হতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ তিনি কোনও কথাই বললেন না। শুধু অসহায়ের মতো নিজের চুলের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন, আর মাঝে-মাঝে মুঠো করে চুল টানতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যে, ভদ্রলোক যেন তাঁর দুঃখ-কষ্টের চাপ আর সহ্য করতে পারছেন না। হঠাৎ এক সময় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দেওয়ালে সজোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলে জোর করে দেওয়ালের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনলুম। হোমস তাঁকে জোর করে একটা আরামকেদারায় বসিয়ে দিলে। তারপর তাঁর কাছে বসে তাঁর হাতে হাত রেখে অনেকদিনের পুরনো বন্ধুর মতো খুব অন্তরঙ্গভাবে ঘরোয়া কথা বলতে লাগল। হোমসের এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। সে যে-কোনও লোককে নিজের করে নিতে পারে।

"আপনার সব কথা আমাকে বলবেন বলেই তো আপনি আমার কাছে এসেছেন, ঠিক কি না?" হোমস ভদ্রলোককে বললে। "তাড়াহুড়ো করে এসে আপনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আগে খানিক বিশ্রাম করে চাঙ্গা হয়ে নিন। তারপর আপনার সব কথা আমি শুনব।"

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। তিনি যে রকম জোরে জোরে আর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন তার থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর মনের মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের টানাপোড়েন চলছে। একসময় পকেট থেকে রুমাল বের করে বেশ ভাল করে ঘাড়-মুখ মুছে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

"আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই পাগল ভাবছেন।" তিনি বললেন।

হোমস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "বুঝতে পারছি যে বেশ বড় রকমের ঝড়ঝাপটা আপনার ওপর দিয়ে গেছে।"

"একমাত্র ভগবানই জানেন যে আমার কী হচ্ছে। কোথাও কিছু নেই, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই সাংঘাতিক বিপদ আমার মাথা একদম খারাপ করে দেবার যোগাড় করেছে। বাইরে আজ পর্যন্ত আমার নামে কেউ কোনও বদনাম দিতে পারেনি। তবে সেরকম বদনামও আমি হয়তো সহ্য করতে পারি। জীবনে দুঃখকষ্ট তো অনেক লোকই পায়। কিন্তু

দুটি কাজের বই, কাজের মধ্যে মজার বই

ভিক্ষু বুদ্ধদেব-এর

পুষ্পচর্চার প্রবেশিকা

ফুল-ফোটানোর সহজ পাঠ

দাম ১৫·০০

যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে"—কবিগুরুর এই কথা শুধু তাদের ক্ষেত্রেই বুঝি বাচ্যার্থে প্রযোজ্য, যাঁরা ফুলের বাগান করা বলতে এলোমেলো চাষ বোঝেন না, সেইসঙ্গে জেনে নিতে চান ফুলের বাগান তৈরির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি। সৌন্দর্যপিপাসার সঙ্গে যাঁদের মনে রয়েছে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসাও। আর, খুব বাল্যবয়স থেকেই যাতে ফুল-ফোটানোর এই কাজে উৎসাহী করে তোলা যায় ছেলেমেয়েদের, যাতে তারা প্ররোচিত হয় নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, সেদিকে লক্ষ রেখেই এই বই, এই পুষ্পচর্চার প্রবেশিকা। এ-গ্রন্থের লেখক ভিক্ষু বুদ্ধদেব পুষ্পচর্চার ক্ষেত্রে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ডালিটি তিনি উজাড় করে দিয়েছেন এই বইতে। ছোটরা শুধু নয়, বড়রাও এতে খুঁজে পাবেন বহু সুপরামর্শ। অসংখ্য সাদা-কালো ও রঙিন ছবি। সেই সঙ্গে উল্লিখিত বিভিন্ন ফুলের বাংলা নামের উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষা ও ইংরেজী শব্দের তালিকা। পরিশিষ্টে নির্ঘণ্ট ও অন্যান্য নানা আকর্ষণ।

যমুনা সেনের

জনাদৃত গ্রন্থের আনন্দ-সংস্করণ

সেলাইয়ের নকশা

দাম ৬·০০

নন্দলাল বসুর কন্যা যমুনা সেনের জনাদৃত গ্রন্থ 'সেলাইয়ের নকশা' দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল। নতুনভাবে সাজিয়ে এ-যুগের চাহিদা মেটাতে প্রকাশ করেছেন আনন্দ পাবলিশার্স। এই সংস্করণও যে সাড়া জাগিয়েছে অত্যল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ-মুদ্রণেই তার প্রমাণ। ঘরে-ঘরেই আজকাল সূচের কাজের প্রচলন হয়েছে। মেয়েরা ইস্কুলে নানারকম ফোঁড় শেখে। বাড়িতে গৃহিনীরাও অবসর সময়ে সূচীশিল্পের চর্চা করেন। কিন্তু ফোঁড়গুলিকে ঠিকমতো সাজাতে না পারলে, ফোঁড়ের বিশেষত্ব বজায় রাখতে না পারলে, মানানসই রঙ ব্যবহার করতে না পারলে—ফোঁড়ের নকশা শিল্প হয়ে ওঠে না। সেই ব্যাপারেই সহায়ক হবে এই বই। প্রকৃতির নিজস্ব রঙের বৈভব কীভাবে সূচীশিল্পে ব্যবহার করা যায়, সুরুচিপূর্ণ একগুচ্ছ নকশার সঙ্গে ব্যবহারবিধি বর্ণনা করে, সেই পরামর্শই দিয়েছেন লেখিকা। নন্দলাল বসুর ভূমিকা এ-বইয়ের অন্যতর আকর্ষণ।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

ঘরে-বাইরে এইরকম মনের কষ্ট আর বদনামের ভয় আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। আর এ তো আমার একার বদনাম নয়। এর সঙ্গে আমাদের দেশের খুব শ্রদ্ধার খুব সম্মানের এক পাত্রের সুনাম জড়িয়ে আছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে।"

হোমস বললে, "আগে আপনি শান্ত হোন। তারপর আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার সমস্যাটা কী আমাকে বলুন।"

আমাদের অতিথি বললেন, "আমার নাম আপনারা হয়তো শুনে থাকতে পারেন।···· আমার নাম আলেকজাণ্ডার হোলডার। থ্রেডনিডল স্ট্রিটে 'হোলডার অ্যাণ্ড স্টিভেনস' নামে যে ব্যাঙ্ক আছে আমি সেই ব্যাঙ্কের একজন অংশীদার।"

আলেকজাণ্ডার হোলডারের নাম আমাদের শোনা ছিল। লন্ডন শহরে যে ক'টা বেসরকারি ব্যাঙ্ক আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আর নামকরা ব্যাঙ্ক হল এই হোলডার অ্যাণ্ড স্টিভেনস ব্যাঙ্ক। আর এই ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার হচ্ছেন মিঃ আলেকজাণ্ডার হোলডার। কিন্তু এমন কী ঘটতে পারে যে, যার জন্যে লন্ডনের এত বিরাট এক ধনী আর মানী লোকের এই রকম অবস্থা ? আমাদের মনে খুব কৌতূহল হল। তিনি কী বলেন তা শোনবার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক তাঁর নিজের মনের সংকোচ কাটিয়ে উঠে কথা বলতে শুরু করলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "বুঝতে পারছি যে নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময়ও আর আমার নেই। সেইজন্যে পুলিশের ইন্সপেক্টর যখনই আমাকে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে বললেন, আমি একটুও দেরি না করে সোজা এখানে চলে এলুম। আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বেকার স্ট্রিট পর্যন্ত এসে তারপর হেঁটেই আপনাদের এখানে চলে এলুম। রাস্তায় যে-রকম বরফ পড়েছে, তাতে গাড়ি করে আপনার কাছে এলে অনেক বেশি সময় লাগত। আর এই পথটুকু হেঁটেই আমি হাঁফিয়ে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, হাঁটাহাঁটির অভ্যেস আমার একদম নেই। যাক, এখন অবশ্য অনেক ভাল বোধ করছি। তাই সব ব্যাপারটা যতটা পারি গুছিয়ে আর সংক্ষেপে আপনাদের বলতে চেষ্টা করছি।

"আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, ব্যাঙ্কের ব্যবসায় বেশ নাম করতে গেলে দুটো জিনিসের খুব দরকার। এক নম্বর হল এমনভাবে টাকা লগ্নি করতে হবে যাতে প্রচুর লাভ হয়। আর দু নম্বর হল যে, যত বেশি আমানতকারী যোগাড় করতে পারা যায় তার চেষ্টা করা আর তাদের সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা। ব্যাঙ্কের লাভ করবার একটা খুব ভাল রাস্তা হল বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া। গত কয়েক বছর ধরে আমরা এই বন্ধকি কারবার করে আসছি। অনেক অভিজাত বংশের নামী লোক তাঁদের লাইব্রেরি, ছবি বা ওই ধরনের শিল্পবস্তু বা দামি জিনিস আমাদের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছেন।

"গতকাল সকালে আমি ব্যাঙ্কে আমার আপিসঘরে বসে কাজ করছি, এমন সময় আমার সেক্রেটারি একটা কার্ড আমাকে এনে দিলে। কার্ডে নামটি দেখে আমি তো হতবাক। যার-তার নাম নয়, এ যে স্বয়ং··· না, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, সে নাম আপনাকে বলাও আমার পক্ষে উচিত হবে না। তবে এটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, এঁর নাম শোনেনি এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম। ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে মানী, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, সবচেয়ে অভিজাত একটি বংশের কর্তার নাম। ইনি যে কোনওদিন আমাদের ব্যাঙ্কে পা দেবেন তা আমার কল্পনারও বাইরে। এ যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য, তা বলে বোঝাতে পারব না। উনি আমার ঘরে পা দেওয়ামাত্র আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করে তাঁকে এই কথাগুলোই বলবার চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু আমাকে বিশেষ কিছু বলতে না দিয়ে তিনি সোজাসুজি কাজের কথা পাড়লেন। তাঁর হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, তিনি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত বাজে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এখন যেমন-তেমন করে কাজটা সাঙ্গ করতে পারলেই বেঁচে যান।

"তিনি আমাকে বললেন, 'মিঃ হোলডার, আমি শুনেছি যে আপনারা টাকা ধার দিয়ে থাকেন।'

"আমি বললুম, 'হ্যাঁ। উপযুক্ত সিকিউরিটি পেলে আমাদের কোম্পানি টাকা ধার দেয়।'

"'আমার এখনই পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাই,' উনি আমাকে বললেন। 'এত সামান্য টাকা আমি আমার যে-কোনও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকেই পেতে পারতুম। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি টাকা নিতে চাই না। তা ছাড়া এই টাকা নেওয়ার ব্যাপারে যা কিছু করবার তা আমি নিজেই করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আমার পক্ষে কোনও বন্ধুর অনুগ্রহ চাওয়া ঠিক নয়।'

"'কতদিনের জন্যে টাকাটা আপনার চাই ?' আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"'আসছে সোমবার আমার কিছু টাকা পাবার কথা। সেটা পেলেই আমি আপনার টাকা আর যা সুদ হয় সব শোধ করে দেব। তবে টাকাটা আমার এক্ষুনি চাই।'

"'দেখুন, সম্ভব হলে আমি ওই টাকাটা আপনাকে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকেই দিতুম। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। যদি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা আপনাকে দিতে হয় তবে আমার অংশীদারের কথা মনে রেখে আমাকে আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আপনি যদি কোনও কিছু গচ্ছিত রাখেন তো তার বদলে টাকাটা আপনাকে দিতে পারি।'

"'হ্যাঁ, আমিও সেইভাবেই টাকা নিতে চাই,' বলেই তিনি তাঁর চেয়ারের পাশ থেকে কালো মরক্কো চামড়ার একটা চৌকো বাক্স তুলে নিলেন। তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বেরিল করোনেটের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই ?'

"'হ্যাঁ শুনেছি। আমাদের সাম্রাজ্যের সব চাইতে দামি আর গর্বের জিনিস।'

"'ঠিক বলেছেন।' উনি চামড়ার বাক্সটা খুললেন। বাক্সের মধ্যে গোলাপি ভেলভেটের নরম আর পুরু আস্তরণের ওপরে বেরিল করোনেট রাখা আছে। 'এতে উনচল্লিশটা বেরিল আছে। যে সোনার পাতে পাথরগুলো বসানো আছে সেটার দামও কম নয়। খুব কম করে ধরলেও এই মুকুটটার দাম আমি যে টাকা চেয়েছি তার দ্বিগুণ হবে। আমার সিকিউরিটি হিসেবে আমি এটাকে জমা রাখতে রাজি।'

"আমি বাক্সটা তুলে নিলুম। তারপর বোকার মতো আমার বহুমান্য অতিথির দিকে তাকিয়ে রইলুম।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

খেলাধুলো

শাবাশ ইস্টবেঙ্গল

অশোক রায়

এশীয় ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ শুরুর ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল কলম্বো পৌঁছে মার্চ পাস্টে যোগ দেয়। ভিসা না পাওয়ায় স্ট্রাইকার জামশিদ নাসিরি এবং চোট থাকায় মনোরঞ্জন শুধু মার্চ পাস্টে নয়, প্রথম ম্যাচেই খেলতে পারল না। কলকাতা এয়ারপোর্টে মনোরঞ্জন আমাকে বলেছিলেন, "হ্যামস্ট্রিং মাস্‌লে চোট আছে। আজ টিমের সঙ্গে যাচ্ছি না। দু' দিন পরে যাব। তবে গেলেও মনে হয় খেলতে পারব না।" 'মনা' দলের সঙ্গে যাচ্ছে না, এই খবরটা প্রদীপ ব্যানার্জি জানতেন না। এয়ারপোর্টে খবরটা আমিই প্রথমে তাঁকে দিই। মুখ দেখেই বুঝেছিলাম মনোরঞ্জন না যাওয়ায় তিনি খুব চিন্তিত। কলম্বো পৌঁছে পি· কে· আর ঝুঁকি নেননি। টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে ১৮ জনের নামের তালিকায় তিনি আহত মনোরঞ্জনের নাম রাখেননি। পি·কে· বুঝতেই পেরেছিলেন মনোরঞ্জন যদি কলম্বো যান, তা হলেও তিনি চোটের জন্য খেলতে পারবেন না। চোট ছিল অলোক, কৃশানু আর ভাস্করেরও।

প্রথম ম্যাচে জোড়াতালি দেওয়া টিম নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয় নেপালের চ্যাম্পিয়ান নিউ রোড ক্লাবের। দুর্বল নিউ রোডের ওপর দিয়ে ভারী রোলার টেনে ৭—০ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গল। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ৪টি এবং দেবাশিস রায় ২টি গোল করেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়াচক্রের বিরুদ্ধে খেলার আগে মনোরঞ্জন কলম্বো পৌঁছলেও খেলায় অংশ নিতে পারলেন না। কারণ তাঁর নাম ১৮ জনের তালিকায় রাখাই হয়নি। জামশিদও পৌঁছতে পারেননি। এই অবস্থায় গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দলের মোকাবিলায় নামল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের সেরা ডিফেণ্ডার এবং সেরা স্ট্রাইকার না থাকায় পুরো সুযোগ নিল আবাহনী। প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে তারা ইস্টবেঙ্গলকে কোণঠাসা করে রাখল তাদের নিজেদের এলাকায়। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে বেশ কয়েকবার পরাজিত করেও আসলাম আর চুন্নু গোল পেলেন না, বার ও পোস্ট বাধা সৃষ্টি করায়। অথচ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একবার মাত্র পালটা আক্রমণ করেই গোল পেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বিশ্বজিতের মাপা থ্রু দুই ডিফেণ্ডারের দ্বিধাগ্রস্ততার সুযোগে পেয়ে যান দেবাশিস রায়। ডান দিকের কোণ থেকে চমৎকার শটে দেবাশিস বল পাঠান গোলে। আগাগোড়া সিটিয়ে থাকার পরেও ইস্টবেঙ্গল যে ম্যাচটা জিততে পারবে এটা ভাবা যায়নি।

তৃতীয় ম্যাচে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সকে ২—০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। গোল করলেন সেই দেবাশিস রায় এবং বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। জামশিদ প্রথম ম্যাচ খেললেও আশানুরূপ খেলতে পারেননি।

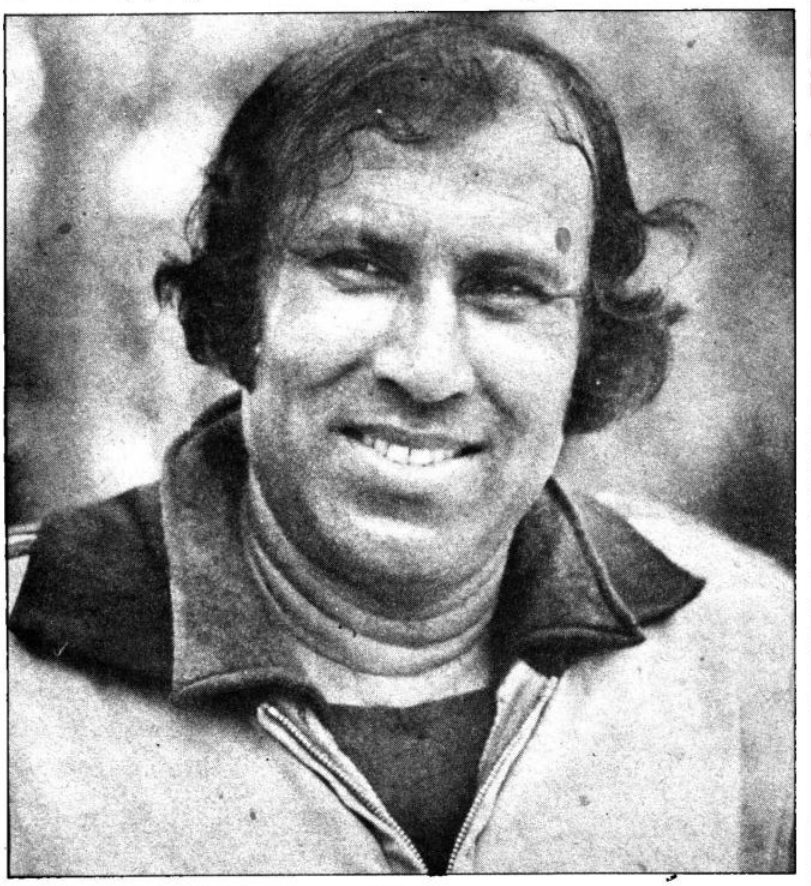

কোচ পি· কে· ব্যানার্জি (মুখে সাফল্যের হাসি)

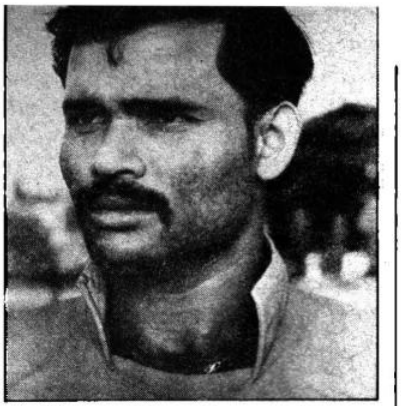

দেবাশিস রায় (দলের টপ-স্কোরার)

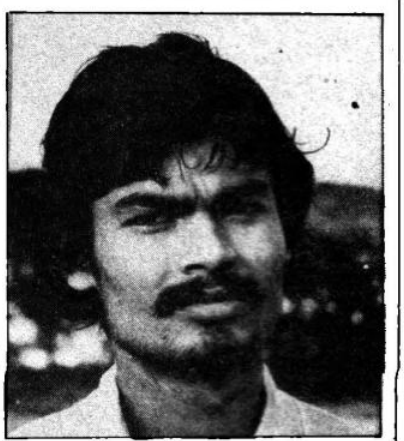

তরুণ দে (টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার)

চতুর্থ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হল মালদ্বীপের ভ্যালেন্সিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে দুর্বল দল ছিল এইটাই। শুরু থেকেই বিপক্ষকে ছিঁড়ে ফেলে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ জেতে পরিষ্কার ন' গোলে। গোল করেন দেবাশিস রায় ৩টি, জামশিদ ২টি, মনোজিৎ দাস ২টি, দেবাশিস মিশ্র ও সমীর চৌধুরী ১টি করে। ডিফেন্সে দুর্দান্ত খেললেন সুদীপ চ্যাটার্জি। দেবাশিস চারটি খেলায় মোট ৭টি গোল করায় টপ-স্কোরারের জন্য নির্ধারিত 'পাওয়ার ট্রফি'র দাবিদার হলেন শ্রীলঙ্কার সন্ডার্স ক্লাবের প্রেমলালের সঙ্গে। দু' জনেরই গোলের সংখ্যা দাঁড়াল ৭।

শেষ ম্যাচে স্থানীয় সন্ডার্সের বিরুদ্ধে খেলাটির আর কোনও গুরুত্বই ছিল না। কারণ তার আগেই পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্যে ইস্টবেঙ্গল সব টিমকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সন্ডার্সের বিরুদ্ধে বিরাট ব্যবধানে না হারলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ানশিপ পাবার কোনও অসুবিধা ছিল না। চাপমুক্ত মনে খেলে ইস্টবেঙ্গল জামশিদের গোলে সন্ডার্সকে হারায়। দেবাশিস সেরা গোলদাতার সম্মান না পেলেও (টপ-স্কোরার ট্রফি শেষ পর্যন্ত লাভ করেন সন্ডার্সের প্রেমলাল, ৯টি গোল) ইস্টবেঙ্গলের স্টপার তরুণ দে টুর্নামেন্টের 'শ্রেষ্ঠ ফুটবলার' নির্বাচিত হন।

১—১২ অকটোবর ফাইনাল রাউণ্ডের খেলা কোথায় হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। সৌদি আরব যেরকম লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে তাতে সেখানেই হয়তো খেলা হবে। তবে সাত দেশের চ্যাম্পিয়ান ক্লাবের মধ্যে আপাতত যে ৫টি ক্লাব ফাইনাল রাউণ্ডে পৌঁছে গেল তারা হল—সৌদি আরবের আল্-আহলি, কুয়েতের আল্-আরবি ক্লাব, সিঙ্গাপুরের টিয়ং বারু ফুটবল ক্লাব, থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক ব্যাঙ্ক স্পোর্টস ক্লাব এবং ভারতের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বাকি দুটি ক্লাবের নাম জানা যাবে সেপ্টেম্বরে।

এই প্রথম একটি ভারতীয় ক্লাব এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে গেল এবং ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। কোচ পি· কে· ব্যানার্জি এবং ইস্টবেঙ্গল দলকে অভিনন্দন।

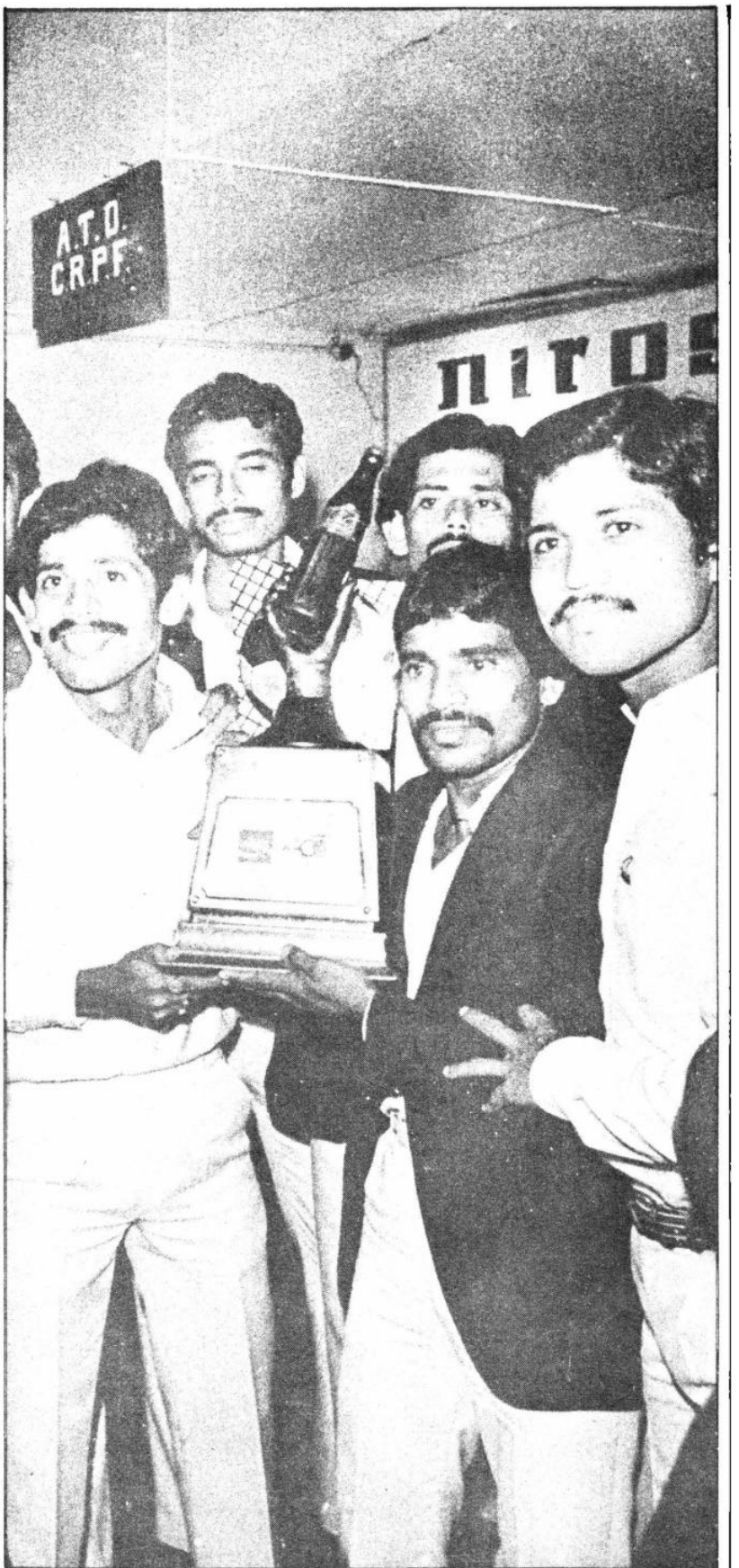

ট্রফি-হাতে কলম্বো-বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন খেলোয়াড়

নিম টুথপেস্ট

শক্ত দাঁত ও সুস্থসবল মাড়ির জন্যে একটি প্রাকৃতিক উপায়

শত শত বৎসর ধরে নিমের দাঁতনই ছিল দাঁতের যত্নের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক উপায় । এতে দাঁত শক্ত হত ও মাড়ি থাকত সুস্থসবল ।

৬২ বছর আগে, ক্যালকাটা কেমিক্যাল নিমের প্রাকৃতিক গুণটুকু নিয়ে তৈরি করেছে একটি টুথপেস্ট···নিম—ভারতের প্রথম ভেষজ গুণেভরা টুথপেস্ট ।

আর এখন, নতুন নিম টুথপেস্টে আছে বাড়তি ফেনা···এর ফলে নিমের ভেষজ ও তেলের জীবাণুনাশী শক্তি আরো সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে । তাছাড়া এতে একটি নতুন সুবাস থাকার ফলে মুখে একটি তরতাজা অপূর্ব স্বাদ অনুভব করা যায় ।

নিম

পৃথিবীর প্রথম ভেষজ টুথপেস্ট । ভারতে এর জন্ম ৬০ বছর আগে

9290A/14 BEN

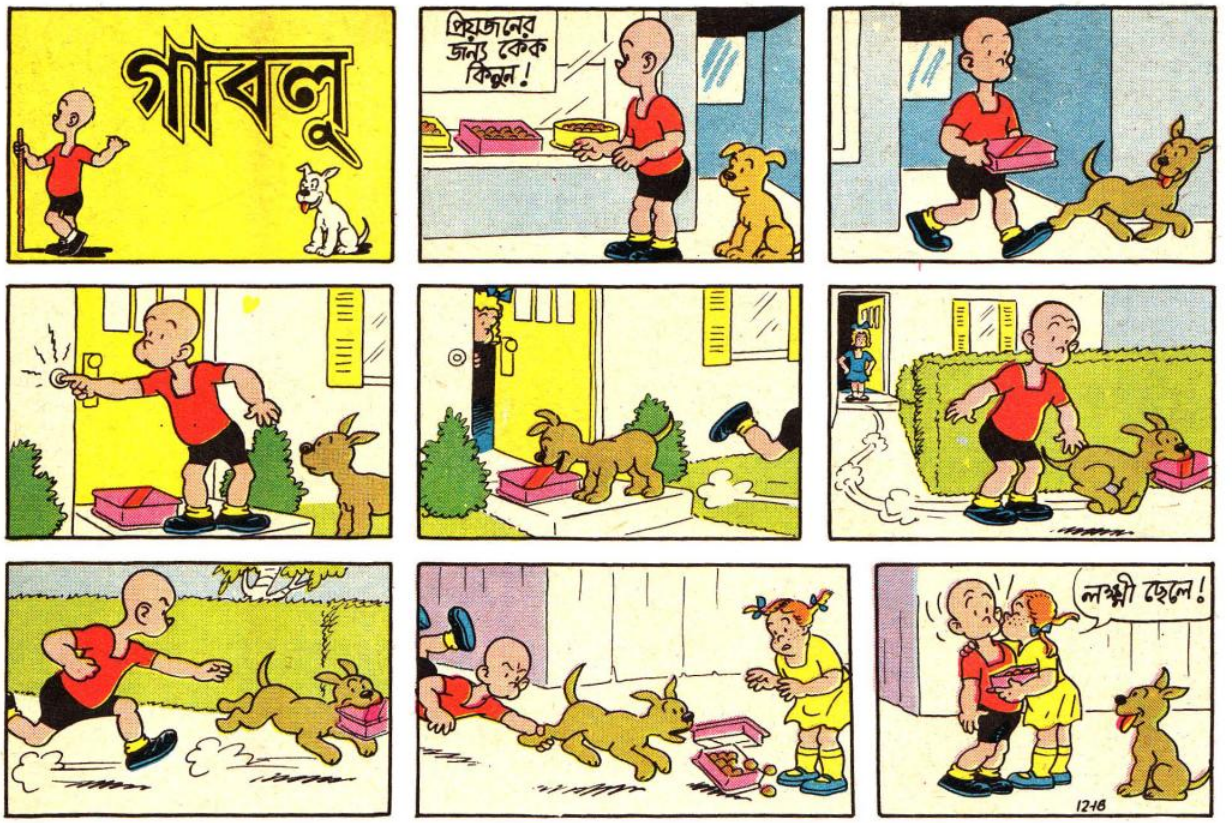
গাবলু
প্রিয়জনের জন্য কেক কিনুন!
লক্ষ্মী ছেলে!
1248

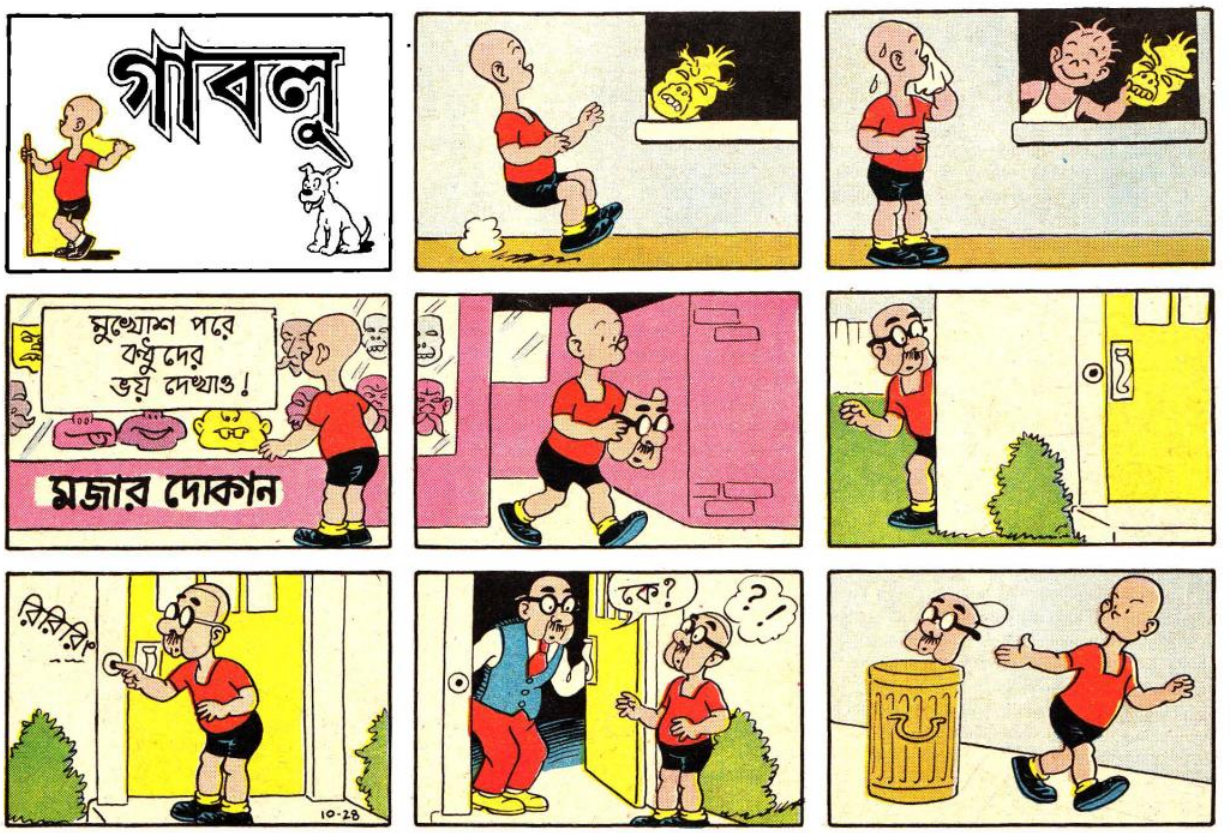
গাবলু
মুখোশ পরে বন্ধুদের ভয় দেখাও!
মজার দোকান
রিরিরি
কে?
?!
10-28

ক্রিকেট ছাড়লেন বেঙ্কটরাঘবন

নৃপতি চৌধুরী

"অনেক দিন ক্রিকেট খেললাম। আর নয়, এবার বুটজোড়া তুলে রাখতেই হবে," কথাগুলো উচ্চারণ করলেন এককালের সুখ্যাত অফ্-স্পিনার বেঙ্কটরাঘবন। "ক্রিকেটের প্রতিটি মুহূর্তই জীবনে দারুণভাবে উপভোগ করেছি, তাই ছাড়ব-ছাড়ব করেও খেলাটা ছাড়তে পারছিলাম না। বিদায় ক্রিকেট।" ১ আগস্ট সাংবাদিকদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরগ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন বেঙ্কট। হাসছিলেন তিনি। হাসির মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক ধরনের চাপা বেদনাবোধ। ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবার সময় বোধহয় এমন দুঃখ সব ক্রিকেটারই পেয়ে থাকেন।

ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক ঐশ্বর্য দান করেছেন চার সুখ্যাত স্পিনার—বিষেন সিং বেদি, ভাগবত চন্দ্রশেখর, এরাপল্লি প্রসন্ন এবং শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবন। এঁদের মধ্যে প্রসন্ন এবং বেঙ্কট দু'জনেই অফ্-স্পিনার হওয়ায় টিমে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে বারে বারে লড়াই করতে হয়েছে দু'জনকেই। অধিনায়ক পতৌদির পছন্দ ছিল প্রসন্ন। ওয়াড়েকরের পছন্দের তালিকার এক নম্বরে ছিলেন বেঙ্কট। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অফ্-স্পিনার হিসেবে প্রসন্ন ছিলেন উঁচু দরের। কিন্তু তাই বলে বেঙ্কট পিছিয়ে ছিলেন না। বিশেষ করে তাঁর লেংথের ওপর দখল ছিল অসাধারণ।

রঞ্জি ট্রফিতে বেঙ্কট প্রথম খেলতে আসেন ১৯৬৩-৬৪ মরসুমে। এবং এ-পর্যন্ত শুধু এই প্রতিযোগিতাতেই পেয়েছেন ৫২২টি উইকেট, যা একমাত্র হরিয়ানার বাঁ-হাতি স্পিনার রাজিন্দর গোয়েল ছাড়া কোনও ভারতীয়র দখলে নেই। রঞ্জিতে তাঁর সেরা বোলিং অঙ্কর বিপক্ষে। ১৯৭৩-৭৪ মরসুমে তিনি এক ইনিংসে পেয়েছিলেন ৪২ রানে ৭ উইকেট। রঞ্জি ট্রফিতে একটি সেঞ্চুরিসহ দু'হাজারের বেশি রানও রয়েছে বেঙ্কটের ব্যাটে।

টেস্ট ক্রিকেটে বেঙ্কট প্রথম খেলতে নামেন ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এবং শুরুর বছরেই দিল্লির মাঠে দুর্দান্ত বোলিং করে নজর কাড়েন ক্রিকেট-অনুরাগীদের। সেই ম্যাচে ১৫২ রানে ১২টি উইকেট পাবার ঘটনাটিই তাঁর টেস্ট-জীবনের সর্বোত্তম বোলিং। ৫৭টি টেস্টে বেঙ্কট মোট উইকেট পেয়েছেন ১৫৬টি (গড় ৩৬·১১)। এবং '৭৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৬৪ রানের ইনিংসসহ টেস্টে তাঁর মোট সংগ্রহ ৭৪৮ রান। টেস্টে বেশ কিছু অসাধারণ ক্যাচও আশ্রয় নিয়েছে বেঙ্কটের বিশ্বস্ত মুঠোয়। টেস্টে তাঁর ধরা ক্যাচের সংখ্যা ৪৪। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৪০০-র বেশি উইকেট পেয়েছেন বেঙ্কট। ভারতীয় ক্রিকেটে সংখ্যাটির অবস্থান একমাত্র বিষেন সিং বেদির পরেই।

বেঙ্কট নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুর অধিনায়ক হয়েছেন ১৯৭০-৭১ মরসুমে। এবং গত মরসুম পর্যন্ত তিনিই ছিলেন রাজ্য দলের ক্যাপ্টেন। ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবার সময় দুঃখ করে বেঙ্কট বলেছেন, "ক্ষোভ রয়ে গেল তামিলনাড়ুকে একবারও রঞ্জি ট্রফি এনে দিতে পারলাম না।" বেঙ্কট ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন ৫টি টেস্টে। এ ছাড়া '৭৫ এবং '৭৯ প্রুডেনশিয়াল কাপে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনিই।

ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে বেঙ্কটকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। শ্রীকান্ত, আজহারউদ্দীন, রবি শাস্ত্রী, শিবরামকৃষ্ণনের মতো দারুণ ক্রিকেটার এখন ভারতীয় ক্রিকেট আলো করে আছে। আমার মনে হয় ওরা ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

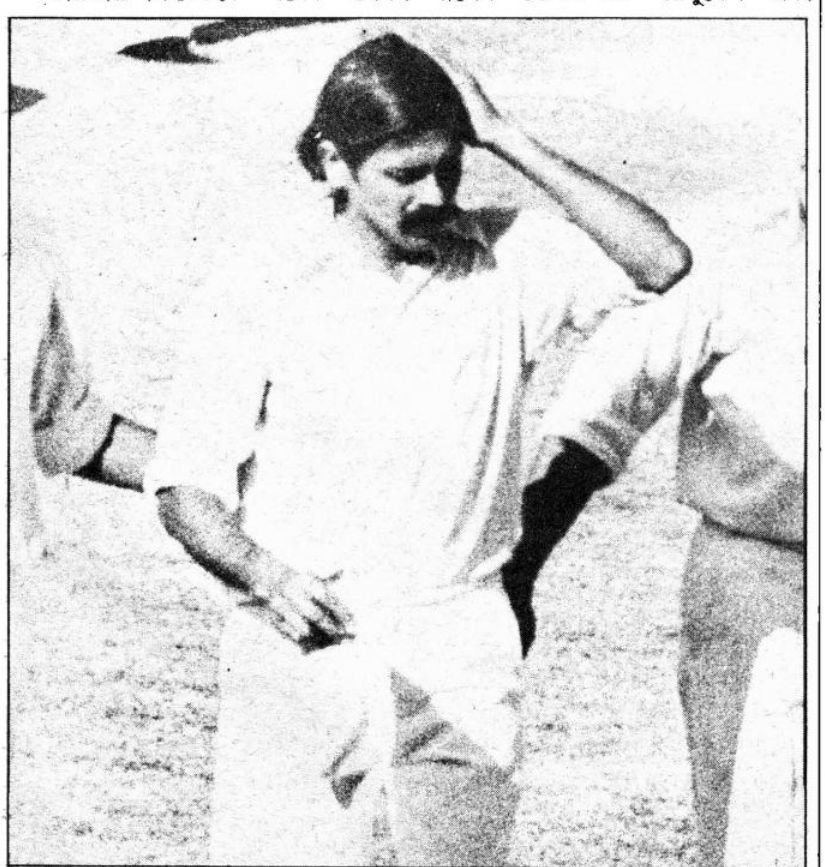

একদিন বীরের গরিমা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন···

ইংল্যাণ্ডের ইনিংসে জয়

সম্রাট রায়

বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছিল অনেকখানি মূল্যবান সময়। পিচও ছিল সহজ, ব্যাটসম্যান-সহায়ক। তবু ওরই মধ্যে থেকে অবিশ্বাস্য জয়ের আনন্দ ছিনিয়ে আনল ইংল্যাণ্ড। বেছে নেওয়া সত্যিই শক্ত, এজবাস্টনে পঞ্চম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জয়ের নায়ক কে ?

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে ডেকেছিলেন সম্ভবত একটাই কারণে। ভারী এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় তাঁর দলের সুইং বোলাররা যদি কোনওভাবে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিং লাইন-আপে ধাক্কা দিতে পারেন। বৃষ্টির সহায়তা এবং দলীয় ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিনটা ভালভাবেই কাটিয়ে দিল। কারণ ১৮১-২ যে-কোনও পরিস্থিতিতেই

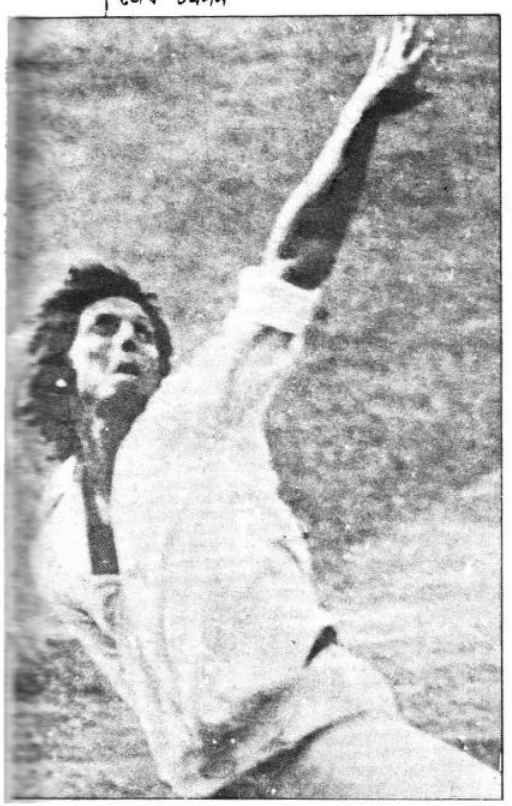

জেফ টমসন

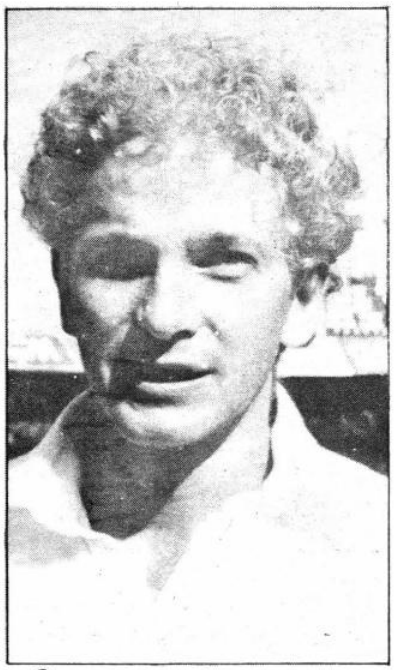

ডেভিড গাওয়ার

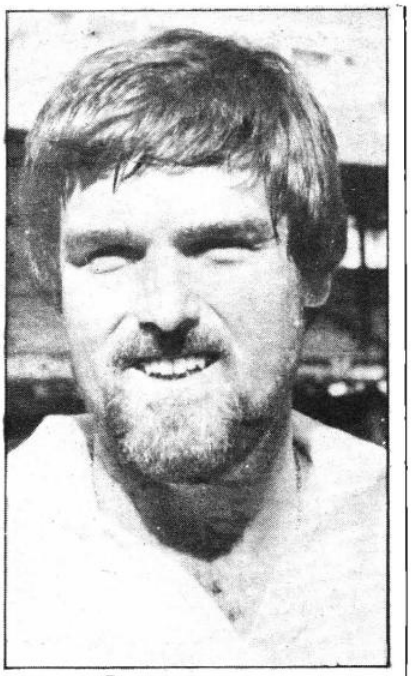

মাইক গ্যাটিং

আশ্বস্ত থাকার মতো স্কোর। ওয়েসেলস ৭৬ এবং ফর্মের তুঙ্গে-থাকা অধিনায়ক বর্ডার ৪৩ রানে অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসটি পাহারা দেবার কাজটি করে যাচ্ছিলেন।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম এক-দিনের ম্যাচে ভারত যে নাটকীয়ভাবে জিতেছে, তা তোমরা জানো। আগামী সংখ্যায় এ-খেলার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের আগে ইংল্যান্ডের বাঁ-হাতি পেস-বোলার রিচার্ড এলিসন রুদ্রমূর্তি ধরেন। অনুকূল আবহাওয়ায় এলিসন ফেরত পাঠান ওয়েসেলস (৮৩) ও বর্ডারসহ (৪৫) চারজন অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারীকে। অস্ট্রেলীয় শিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে একসময় মাত্র ২৬ বলে তিনি ঝুলিতে পোরেন ৩ জনকে। শেষ পর্বে জিওফ লসন (৫৩), ম্যাকডারমট (৩৫) এবং টমসনের (২৮) দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া পৌঁছয় ৩৩৫ রানে। এলিসন বেশ কিছুদিন পরে ইংল্যান্ড দলে ফিরে ৬টি উইকেট নেন ৭৭ রানে।

ইংল্যাণ্ড নড়বড় করতে-করতে শুরু করে ইনিংস। ওয়ান-চেঞ্জ বল করতে এসে ৩৫ বছর বয়সী টমসন একটা চমৎকার লেগকাটারে গ্রাহাম গুচকে ফিরিয়ে দেন। দুটি কারণে ঘটনাটি মনে রাখার মতো। এক, টেস্ট ক্রিকেটে এটি টমসনের নিজস্ব ২০০তম শিকার। দুই, দিনটি ছিল তাঁর ৩৫তম জন্মদিন। গুচের উইকেটটি নিয়ে টমসন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শত উইকেট লাভের গৌরবও অর্জন করলেন।

কিন্তু ইংলিশ ইনিংস মেরামতির কাজ হাতে নেন ওপেনার টিম রবিনসন এবং ক্যাপ্টেন ডেভিড গাওয়ার। দ্বিতীয় উইকেটে ওই জুটিতে সংগ্রহ হয় ৩৩১ রান। রবিনসন এই সিরিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি (১৪৮) করে আউট হলেও ইংল্যাণ্ডকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেন গাওয়ার (২১৫) এবং মাইক গ্যাটিং (১০০ নঃ আউট)। এতদিন গাওয়ারের সর্বোচ্চ রান ছিল এই মাঠেই ভারতের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২০০। চতুর্থ দিন চা-বিরতির পরে ইংল্যাণ্ড ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে পাঁচ উইকেটে ৫৯৫ রানে।

কিন্তু অনবরত বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও চতুর্থ দিনের শেষেই অস্ট্রেলিয়া কুঁকড়ে গেল এলিসনের সুইংয়ের দাপটে। ৩৭ রানে পাঁচ উইকেট পড়ায় অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরোধ ভেঙে যায়। বিপজ্জনক বর্ডারসহ এলিসন ৪ উইকেট নেন মাত্র ২ রানে। স্বপ্নময় বোলিং। পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের জয় ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষায়। অস্ট্রেলিয়া গুঁড়ো হয়ে যায় মাত্র ১৪২ রানে। ফলে ইংল্যাণ্ড ইনিংস ও ১১৮ রানে জিতে চলতি সিরিজে এগিয়ে গেল ২-১ মার্জিনে।

NEW!

POWER PACKED SURF

নতুন পাওয়ার প্যাকড্ সার্ফ।

আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ফর্মুলেশনে তৈরী, ফলে এর কণায় কণায় ঠাসা থাকে শক্তির ভাণ্ডার: কাপড়ের গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছে সাফ করতে পারে! আপনার সমস্ত সাদা কাপড়কে রাখে সবচেয়ে সাদা, আর রঙীন কাপড়কে সবচেয়ে উজ্জ্বল।

অথচ কাপড় থাকে পুরোপুরি সুরক্ষিত, নতুনের মত: প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তকতকে তাজা, ঝকঝকে পরিষ্কার, ধবধবে সাদা...নতুনের মত!

ধোলাইয়ের পর ধোলাই!

নতুন অনুপম সুগন্ধ: যা জড়িয়ে থাকবে আপনার জামাকাপড়ে: কত পরিষ্কার, কত তাজা, কাছে থেকেও কত মজা!

আকর্ষণীয় নতুন প্যাক: যা ভেতরের এই নতুন পাওয়ার প্যাকড্ ফর্মুলেশনের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়।

আসুন! আজই নিন নতুন পাওয়ার প্যাকড্ সার্ফ!

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

LINTAS-SU-324-2619BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

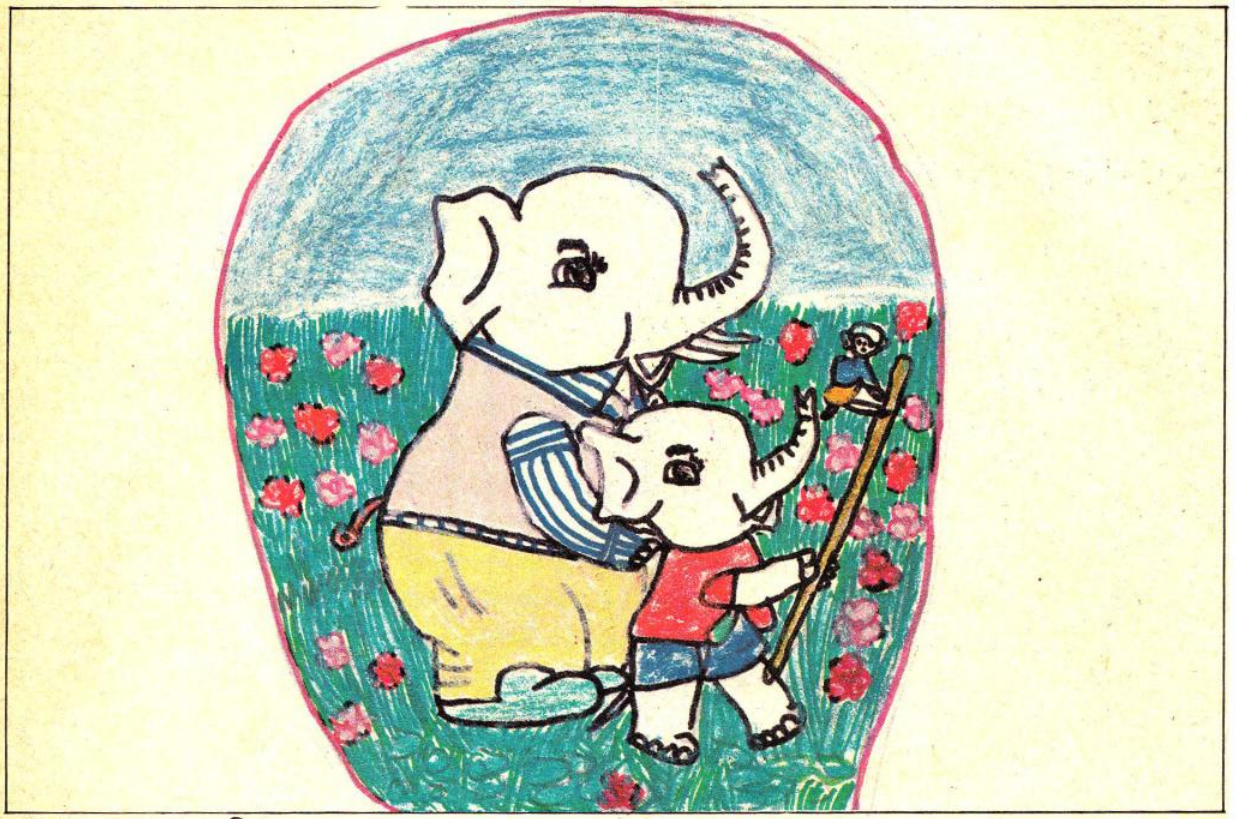

ছবি এঁকেছে **প্রজ্ঞাপারমিতা দে** (বয়স ১০)

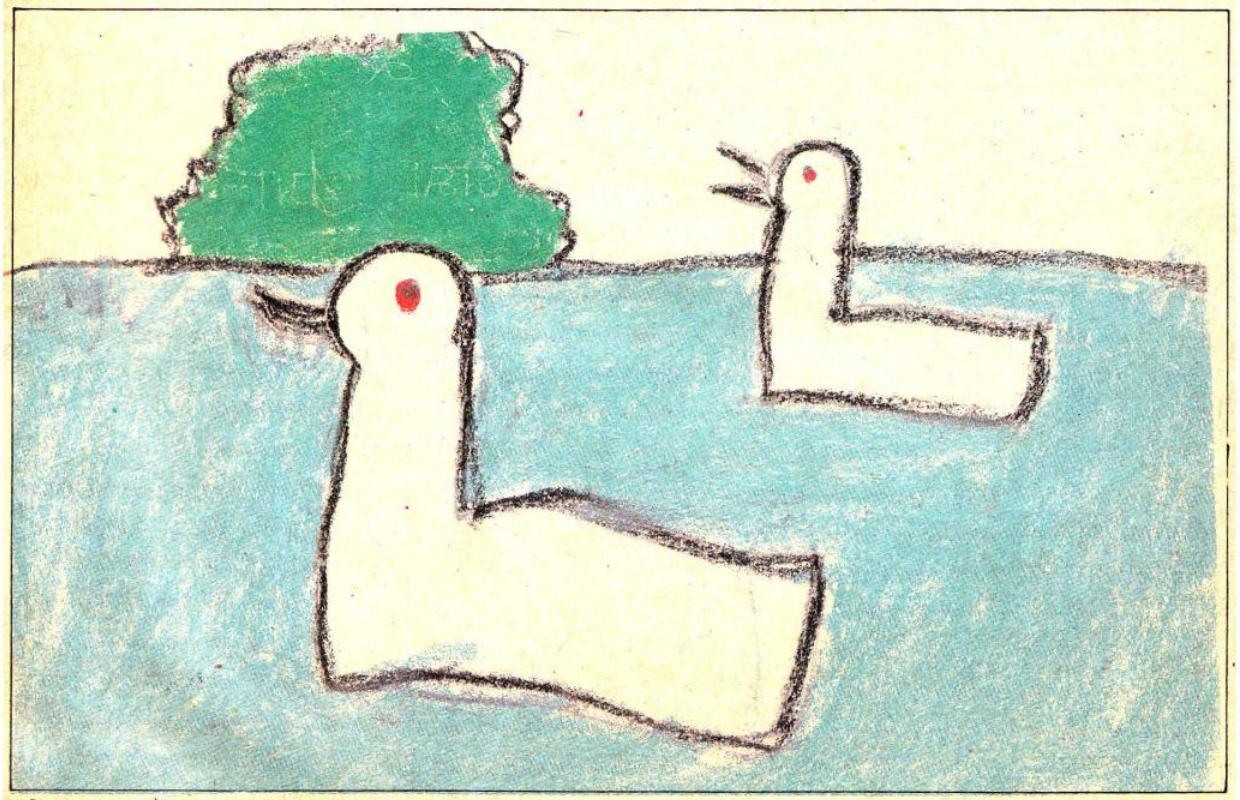

ছবি এঁকেছে **সৌমাভ গুপ্ত** (বয়স ৭)

প্রতিশোধ

রাত তখন সাড়ে-দশটা। মামাবাড়ি থেকে আমি একলা ফিরছিলাম বাড়িতে। মামাবাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব দূরে না হলেও দুই বাড়ির মাঝে বিশাল এক মাঠ পড়ে, যার নাম পোড়ো মাঠ। সেখানে একটা সেতু আছে। সেতুটার কাছে যেতেই দেখি, জনা-দশেক লোক আমাকে ঘিরে ফেলেছে।

তাদের একজন আমাকে বলল, "আমরা তোমাকে এখন নিয়ে যাব, তারপর তোমার ব্যবসায়ী বাবার কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করব। আমরা জানি, তুমি তোমার বাবার একমাত্র আহ্লাদী মেয়ে।"

কথাটা বলার পরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার নায়ক স্বয়ং বাবাসাহেব। ইনি সাধু-প্রকৃতির মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই, গুণ্ডা-ডাকাতরাও তাঁকে সম্ভ্রম করে চলে। বাবাসাহেব কোত্থেকে হঠাৎ এসে ডাকাতগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দুটি ডাকাতের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলতেই সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। জানতে পারলাম, বাবাসাহেবের দাপটে অতিষ্ট হয়ে দুজন ডাকাত গতকাল রাত সাড়ে-দশটায় ওই পোড়ো মাঠে তাঁকে খুন করে। বুঝতে পারলাম, আজ রাত সাড়ে-দশটায় ওই মাঠেই একটি মেয়ের জীবন উদ্ধারের সঙ্গে-সঙ্গে দুই ডাকাতের উপর প্রতিশোধ নিলেন বাবাসাহেবের আত্মা। এ-কথা মনে হওয়ার পরে আমার দুচোখ জলে ভরে গেল।

দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

শোনপাপড়ি খাওয়া

ছোট হলেও সব আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোট মানে তখন আমি খুব ছোট। কোথাও পুজোর ঘন্টা বাজলে আমার মনে হত, ওই বুঝি শোনপাপড়িওয়ালা আসছে। গোরুরগাড়ির গোরুর ঘন্টার শব্দেও আমার মন নেচে উঠত। দেখতাম শোনপাপড়িওয়ালা আসছে কি না! শোনপাপড়ি খেতে আমি খুব ভালবাসি।

সেদিন শোনপাপড়িওয়ালা এসেছিল। মা তখন বাজারে, বাবা অফিসে। দাদুর কাছে পয়সা চাইতে দাদু রেগে গিয়ে বললেন, "কাল খেয়েছিস, রোজ-রোজ খেলে অসুখ করবে।"

আমার কাছে তখন পয়সা ছিল না। তবু আমি রাস্তার দিকে ছুটলাম। রাস্তায় গিয়ে দেখি অনেকে শোনপাপড়ি কিনছে। তাই দেখে আমার খুব কান্না পেল। ছুটে বাড়িতে এসে আবার সব তোলপাড় করে পয়সা খুঁজলাম। খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ দেখি বাক্সের মধ্যে একটা ডিবে। ডিবেটা খুব ভারী, ওটা নাড়ানাড়ি করলে পয়সার মতো শব্দ উঠছিল। ভাবলাম, পয়সা আছে এতে। কিন্তু কী মুশকিল, ডিবেটা খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই।

চাষি মাঠে গম কাটছিল। ডিবে খোলার জন্যে সেটা পকেটে করে তার কাছে নিয়ে গেলাম। খোলা হতে দেখা গেল, তার মধ্যে পয়সা নেই। তাতে আছে আমার তক্তি, আংটি এবং মায়ের হাতের ও কানের গয়না। ওগুলি দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর ফিরে এসে যথাস্থানে ওটা রেখে দিলাম।

দু'চার দিন পরে মা গয়না পরার জন্য ডিবে খুলে দেখেন একটা কানের দুল নেই। মা চারদিক তোলপাড় করছেন দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আসল কথা প্রকাশ করে মায়ের খোঁজাখুঁজি বন্ধ করার মতো সাহস আমার ছিল না। পরে কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না যে, শোনপাপড়িওয়ালার ঘন্টা শুনলেও কেন আমি আর পয়সা চাই না।

তিয়েন ঘোষ (বয়স ১০)

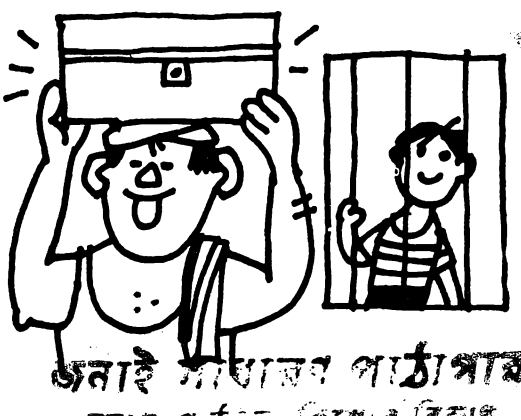

জনাই সাধারণ পাঠাগার

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

...র সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

"আমি আমার বাচ্চাদের, এক কাপ দুধে দু'চামচ করে পুষ্টিগুণ ও আস্বাদেভরা পানীয় বোর্নভিটা, দিনে দু'বার ক'রে দিই।

বোর্নভিটা থেকে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টি পায় বলে আমার বাচ্চারা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি যথাযথভাবে পায়— তাইতো, পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হ'বেই খাওয়াতে।"

এটি বোর্নভিটা ভরা বক্স.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

এবার প্রতি ৫০০ গ্রাঃ রিফিল প্যাকের ওপর ২ টাকা বাঁচান।

ANANDAMELA 18 SEPTEMBER, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731